দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

এদেশে প্রগতিশীল
তকমাধারীরাই
বেশি সাম্প্রদায়িক
—পৃ: ১২

সামাজিক সমতা
ও সেবাকাজের মূর্ত-পুরুষ
বালাসাহেব দেওরস
—পৃ: ১৪

৬৮ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ১১ জানুয়ারি ২০১৬।। ২৫ পৌষ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

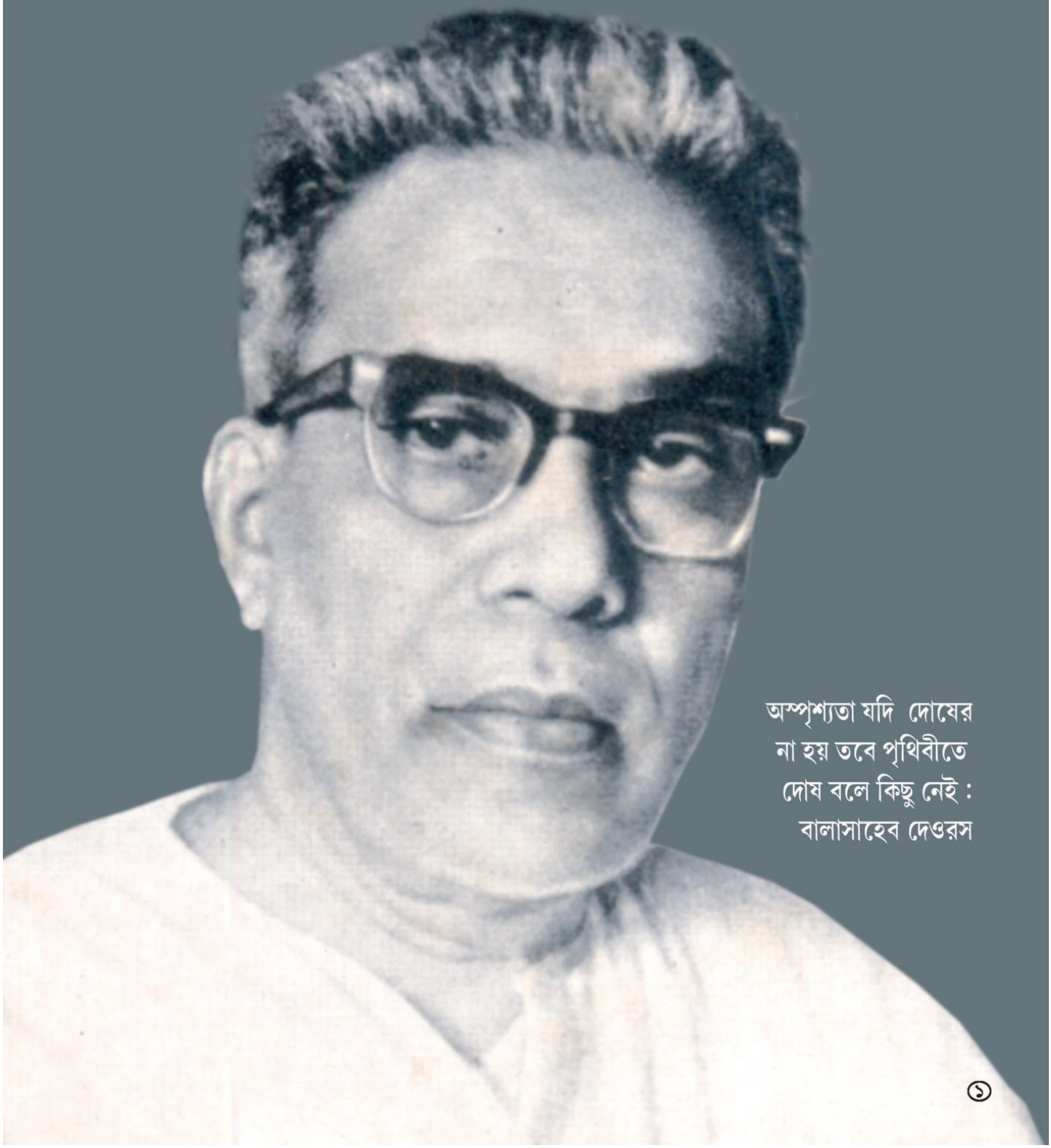

অস্পৃশ্যতা যদি দোষের
না হয় তবে পৃথিবীতে
দোষ বলে কিছু নেই :
বালাসাহেব দেওরস

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ২৫ পৌষ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১১ জানুয়ারি - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-১০

ভারত-পাক সমঝোতা নিঃসন্দেহে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১১

এদেশে প্রগতিশীল তকমাধারীরাই বেশি সাম্প্রদায়িক ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

সামাজিক সমতা ও সেবাকাজের মূর্ত-পুরুষ বালাসাহেব দেওরস ▯ সুকেশ মণ্ডল ▯ ১৪

উপনিষদের কালজয়ী শিক্ষা সমরসতা ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৭

ইউরোপে মুসলমান শরণার্থী ▯ রবীন্দ্রনাথ দত্ত ▯ ২০

স্বামী বিবেকানন্দ ও সামাজিক সমতা ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২১

বৈদিক সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের কথা ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২৩

যতদিন না রাজ্যসভার সংখ্যাতত্ত্ব বদলায় 'মোদীনমিক্সে'র বদলে 'জোগাড়নমিক্স'-কেই কাজে লাগাতে হবে ▯ জয় পণ্ডা ▯ ২৭

অস্পৃশ্যতা যদি দোষের না হয় তবে পৃথিবীতে দোষ বলে কিছু নেই : বালাসাহেব দেওরস ▯ ২৭

একদা গঙ্গাসাগর মেলায় ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৯**▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ
বিশ্ব উষ্ণায়ণ

পরিবেশ দূষণ ও বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ণের ফলে পৃথিবীতে যে সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে তা আণবিক মহাযুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সম্প্রতি প্যারিসে এই ভয়াবহ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে বিভিন্ন দেশের নেতারা এক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গ নিয়েই এবারে আলোচনা করেছেন ড. অভিজিৎ মুখার্জি ও অধ্যাপক মোহিত রায়।

প্রকাশিত হচ্ছে ১৮ জানুয়ারি, ২০১৬।। দাম একই থাকছে ১০ টাকা

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

আলোচনার পথ খোলা রাখা চাই

পাঠানকোটের বায়ুসেনার ঘাঁটিতে জঙ্গি আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। জঙ্গিদের উদ্দেশ্যসাধন হয় নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বায়ুসেনার ঘাঁটিতে প্রবেশ করিয়া বিমান ও হেলিকপ্টার-সহ সামরিক সম্ভারের যতদূর সম্ভব ক্ষতি সাধন করা। তাহাদের লক্ষ্য পূরণ সফল না হইলেও ভারত পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে যে আলাপ আলোচনা চলিতেছিল এক্ষেত্রে তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এই দোটানার জন্যই জঙ্গিদের উদ্দেশ্য কিছুটা হইলেও সফল হইয়াছে। কিন্তু এই আলাপ-আলোচনা বাতিল করিলে পরোক্ষে তাহা জঙ্গিদের বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধিতে সহায়ক হইবে। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির হইয়া নরেন্দ্র মোদীর সহিত প্রথম বৈঠকেই সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ জানাইয়াছিলেন, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের উপরে তাঁহার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নাই। এই সন্ত্রাসের নিয়ন্ত্রণ করিতেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, আই এস আই এবং তাহার পিছনে থাকা জেহাদি শক্তি। এই শক্তি বরাবরই চাহিয়াছে সন্ত্রাস। বাজপেয়ী জমানায় লাহোর বাসযাত্রার পরই শুরু হইয়াছিল কার্গিল যুদ্ধ। সেই সময়ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নওয়াজ শরিফ। তখনও পাকিস্তানি সেনা ও পাক-গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই এবং জেহাদি জোট দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক চাহে নাই। পরবর্তীকালে পাকিস্তানি সেনারা বিদ্রোহ করিয়া শরিফের ক্ষমতা দখল করিয়াছিল। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী গণতন্ত্র সহ্য করিতে পারে না। তাহাদের উদ্দেশ্যই হইল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা। আই এস আই এবং জেহাদি শক্তিগুলিও এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বরদাস্ত করিতে রাজি নয়। মোদী শরিফ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির উদ্দেশ্যে যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন স্পষ্টতই তাহাতে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি এবং পাকিস্তানের সেনা ও আই এস আই-সহ ভারত বিদ্বেষীরা বিচলিত। তাই এই সন্ত্রাসবাদী হামলা।

সন্ত্রাসী জঙ্গিদের এই হামলার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিয়াছে মোদী সরকারের পাকিস্তানের প্রতি এই বন্ধুত্ব বাস্তবসম্মত কিনা। কংগ্রেসের নেতারা এখন এই প্রশ্ন তুলিয়া বিজেপি-কে কটাক্ষ করিতেছেন। আজ মোদীর প্রচেষ্টাকে বাড়াবাড়ি বলিয়া তাঁহাকেই দায়ী করিতেছে কংগ্রেস। অথচ এই কংগ্রেসই কয়েকদিন পূর্বে প্রচার করিয়াছিল মোদী চরম মুসলমান বিরোধী এবং তাহার জন্যই পাকিস্তানের সহিত সম্পর্কের উন্নতি ঘটিতেছে না। কংগ্রেস নেতা সলমন খুরসিদ এবং মণিশঙ্কর আইয়ার পাকিস্তানে যাইয়া 'মোদী পাকিস্তান বিরোধী' বলিয়া সমালোচনা করিয়া আসিয়াছিলেন। আজ কংগ্রেস অন্য কথা বলিতেছে। কিন্তু বাস্তব হইল— মোদী এবং নওয়াজ শরিফের এই উদ্যোগ বাস্তবসম্মত বলিয়াই তা ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় এই হামলা। নরেন্দ্র মোদী এই কারণেই বলিয়াছেন সন্ত্রাসে দুই দেশের কথা বন্ধ হইবে না। তাই আলোচনা চালাইয়া যাইতেই হইবে, কারণ বর্তমান সময়ে যুদ্ধ বিকল্প হইতে পারে না। পাকিস্তানের একটি অংশ যদি শান্তির কোনো উদ্যোগকে বানচাল করিয়া দিতে চায় তাহার জন্য উভয় দেশের নেতৃত্বকে সতর্ক থাকিতে হইবে। পাঠানকোটের মতো ঘটনা যাহাতে আর না ঘটিতে পারে তাহা সুনিশ্চিত করিবার দায়িত্ব এই দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর। আর পাকিস্তানে জঙ্গিরা যাহাতে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ভারতের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজে জড়িত হইতে না পারে, তাহা সুনিশ্চিত করিতে হইবে পাক প্রধানমন্ত্রীকে। আমাদের উচিত আলোচনার পথ খোলা রাখিয়া সন্ত্রাসবাদীদের সমস্তরকমের হুমকিকে কঠোর ভাবে মোকাবিলা করা। আলোচনার পথ রুদ্ধ হইলে শেষ হাসি হাসিবে সন্ত্রাসবাদীরাই। বর্তমানে মোদীর পাকিস্তান নীতির অন্যতম চ্যালেঞ্জ হইল আলোচনা অব্যাহত রাখিয়াও দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

যে সমস্ত সেকুলার বুদ্ধিজীবী এতদিন নরেন্দ্র মোদীকে মুসলমান বিরোধী, পাকিস্তান বিরোধী বলিয়া কংগ্রেসের মতোই কটাক্ষ করিতেন, তাঁহারা এইবার পত্নীর আঁচলের তলায় মুখ লুকাইবেন, না মোদীর এই উদ্যোগে সামিল হইবেন!

সুভাষিতম্

ন কশ্চিদপি জানাতি কিং কস্য শ্বো ভবিষ্যতি।
অতঃ শ্ব করণীয়ানি কুর্যাদদৈব বুদ্ধিমান।।
আগামীকাল কী হবে তা কেউ জানে না। অতএব কালকের করণীয় কাজটি বুদ্ধিমান ব্যক্তির আজই করা উচিত।

জেহাদি তাণ্ডবে উত্তপ্ত মালদার কালিয়াচক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মুসলমান সংখ্যাধিক্যের ফলে মালদা জেলায় এক আতঙ্কের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এমনকী মুর্শিদাবাদের তুলনায় এই জেলায় একের পর এক জেহাদি তাণ্ডবে স্থানীয় হিন্দুরা তটস্থ। গত ৩ জানুয়ারী এমনই এক ধর্মীয় মিছিলের অজুহাতে মালদার কালিয়াচকে হিন্দুদের দোকানপাট লুট, বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটালো জেহাদিরা। যেখানে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশের ওপরও অমানবিক অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। কয়েক লক্ষ সশস্ত্র মুসলমানের কাছে কার্যত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় প্রশাসনও।

জেহাদি তাণ্ডবে অগ্নিবিধ্বস্ত কালিয়াচক থানার গাড়িগুলি।

গত ১ ডিসেম্বর ২০১৫ উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে হিন্দু সহাসভার নেতা কমলেশ তিওয়ারী নাকি মুসলমান ধর্মগুরু নবি মহম্মদের নামে অবমাননাকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ তোলে 'এদারা- এ-শারীয়া' -নামে এক মুসলমান মৌলবাদী সংগঠন। এরই প্রতিবাদে লক্ষাধিক মুসলমান মালদার কালিয়াচক-সহ বেশকিছু জায়গায় লুঠতরাজ চালায়। এই ঘটনায় কালিয়াচকের ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সরকারি বাস সহ মোট ৪টি বাসে ইট, পাথর, লাঠি দিয়ে ভাঙচুর চালানো হয় ও বাসগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি বাসের যাত্রীদের প্রাণ অল্পের জন্য রক্ষা পায়। সে সময় একটি বি এস এফের গাড়ি মিছিল ভেদ করে যাওয়ার চেষ্টা করলে সেটিও ভাঙচুর করা হয়। সেই গাড়িতে উপস্থিত বি এস এফ-এর এক সিও এবং এক জওয়ান গুরুতর আহত হয় বলে বি এস এফ সূত্রে জানা যায়। এই ঘটনায় এলাকায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র এখানেই থেমে থাকেনি জেহাদি মুসলমানরা। কমলেশ তিওয়ারীর নামে বিতর্কিত মন্তব্যের অজুহাতে কালিয়াচক থানা ঘেরাও করে তারা। সেখানে থাকা ১০ টি পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও আই সি সুব্রত ঘোষ, এ এস আই রাম সাহা, দেবদুলাল সরকার, এস ভৌমিক সহ ৪ জন সিভিক পুলিশকে বেধড়ক মারধোর করে। আহত অবস্থায় তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের ওপর এই অমানবিক অত্যাচার চললেও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তারা কিন্তু প্রথম থেকেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা কোনোরকম চেষ্টা করেনি বলে অভিযোগ। এমনকী পুলিশের ওপর অত্যাচার চলার সময়েও উত্তপ্ত পরিবেশ শান্ত করতে মালদার এসপি পুলিশকে শূন্যে গুলি চালানোর অনুমতি দিতে চায়নি। কারণ পুলিশ গুলি চালালে যদি কেউ হতাহত হোত তাহলে সরকারের সংখ্যালঘু ভোটে কোপ পড়তে পারে এই আশঙ্কাতেই শাসক দল পুলিশের ওপর চাপ বাড়াতে থাকে। কিন্তু থানা লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে পুলিশ শূন্যে ৪০ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। জেহাদির পালটা গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয় গোপাল তিওয়ারী নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা। মূলত এ রাজ্যে শাসক দলের তোষণের ফলেই আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে পুরো মালদা জেলায় ।

মুসলমান সংগঠন 'এদারা-এ-শারীয়া কালিয়াচক'-এর মদতেই এই আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করে মালদার জেহাদি মুসলমানরা। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি হ্যান্ডবিলও ছড়ানো হয়। যেখানে মালদার মুসলমানদের একটি প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। সেই মতো মালদার সুজাপুর, খালতিপুর-সহ আরো বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে মিছিলগুলি যখন কালিয়াচকের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের উদ্দেশে আসছিল তখন তারা হিন্দুদের বাড়ি-ঘর এবং বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশনে ভাঙচুর চালাতে থাকে। এমনকী সুজাপুর, খালতিপুরের কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই জেহাদিরা হিন্দু গ্রাম বালিয়াডাঙার বেশ কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে লাঠি, বল্লম নিয়ে আক্রমণ করে লুঠতরাজ চালায়। বাড়িতে থাকা নাবালিকা মেয়েকে প্রচণ্ড মারধোর করে। খালতিপুর স্টেশনে মালগাড়ি এবং লোকাল ট্রেন ভাঙচুরও করে বলে জানা যায়। তবে পুরো ঘটনাতেই পুলিশকে

নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরেই লক্ষ্ণৌয়ের জনৈক কমলেশ তিওয়ারির গ্রেপ্তারের দাবিতে হাওড়ার মুসলমানরা সেখানকার ডিএম অফিস ঘেরাও করে। এবং সেখানে তারা স্লোগান দেয় 'কমলেশকে ফাঁসি দাও নাহলে আমাদের হাতে তুলে দাও।' সূত্র মারফত জানা যায়, সেখানেও প্রচ্ছন্ন মদত ছিল 'এদারা-এ-শারীয়া' নামে এই মুসলমান মৌলবাদী সংগঠনের। এ ঘটনার জন্য স্থানীয় হিন্দুরা শাসক দলের দিকে আঙুল তুলেছে। তাদের দাবি এতবড় মৌলবাদী আক্রমণেও সরকার চুপ, প্রশাসন নিষ্ক্রিয়।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, শাসক দলের জন্যই আজ এত বাড় বাড়ন্ত সংখ্যালঘুদের। নাহলে তারা কখনই নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ার মতো সাহস দেখাতে পারে না এবং শাসক দলের চাপেই পুলিশকে চুপ থাকতে দেখা গেছে। এ বিবরণ দিতে গিয়ে কালিয়াচক থানার এক এস আই কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, 'গত তিন বছরে এই থানায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। আমরা আতঙ্কে রয়েছি।' যদিও এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, হয়তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২৭ শতাংশ ভোটের কথা চিন্তা করেই এ ঘটনাকে ছোট ঘটনা বলতে পিছপা হবেন না।

কালিয়াচকের রাস্তায় জেহাদিদের তাণ্ডব।

সম্মুখ সমরে প্রাণ দিলেন বীর জগদীশ সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাঠানকোটের জেহাদি হামলায় দুঃসাহসিক বীরত্বের পরিচয় দিয়ে প্রাণ দিলেন সেনা কনস্টেবল জগদীশ সিং। জইস-এ-মহম্মদ পরিচালিত ও পাকিস্তানি মদতপ্রাপ্ত এই জেহাদি সন্ত্রাসীরা ভারতীয় বায়ু সেনার ছাউনির ওপর আক্রমণ চালাবার সময় কনস্টেবল সিং ক্যান্টিনে তাঁর আহার সারছিলেন। জেহাদিদের উপর্যুপরি গুলিবর্ষণের মুখে অকুতোভয় জগদীশ এ কে ৪৭ ধারী সন্ত্রাসবাদীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেন। সেই অস্ত্র দিয়েই মুহূর্তে তিনি শত্রুকে ঝাঁঝরা করে দেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই জগদীশের ওপর আছড়ে পড়ে অন্য জেহাদির বুলেট। প্রাণ হারান বীর সৈনিক জগদীশ সিং।

বায়ুসেনা ছাউনির কমান্ডার জে এস ধামুন জানান, শত্রুর মোকাবিলায় নিরস্ত্র জগদীশ সিংয়ের বীরত্ব সেনা বাহিনীর কাছে অনুপ্রেরণার কাজ করবে।

আই এস জঙ্গিদের যম ইজরায়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জুরেগেন টডেনঅফার নামের এক জার্মান সাংবাদিকের সাম্প্রতিক প্রকাশিত বই-য়ের পাতায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সূত্র অনুযায়ী এই সাংবাদিক আই এস অধিকৃত তথাকথিত ইসলামিক রাজত্বের সদ্য বিগত হওয়া বছরে ১০ দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তথ্য অনুযায়ী তিনিই একমাত্র পাশ্চাত্য সাংবাদিক যিনি আই এস-এর ডেরায় ঢোকার পর জীবিত ফিরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা লিখতে পেরেছেন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক Jews News সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সম্ভাব্য আক্রমণ শানানো ও দেশ অধিকার করে খিলাফতি শাসন প্রতিষ্ঠা করার যে তালিকা এই জঙ্গি ধর্মীয় সংগঠনের পরিকল্পনায় রয়েছে সেখানে ইজরায়েল নাম নেই। পশ্চিম এশিয়ায় ইসলামিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পিত প্রারম্ভিক তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে অত্যন্ত স্বনির্ভর, সমর কুশলী ও ইসলাম-বিরোধী এই দেশটিকে। টডেনঅফার জানান, আই এস মনে করে যা তাঁকে তারা জানিয়েছে যে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী, তাদের মোকাবিলার ক্ষমতা আই এস-এর নেই। এ প্রসঙ্গে আই এস-এর অভিমত তারা আমেরিকান ও বৃটিশ স্থল বাহিনীর অনায়াসে মোকাবিলার ক্ষমতা ধরে। কেননা এই দুই বাহিনীরই গেরিলা যুদ্ধ বা চোরাগোপ্তা সন্ত্রাসী হামলা সামাল দেওয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু ইজরায়েল কঠিন ঠাঁই। সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত আক্রমণ মোকাবিলা, ঝটিকা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনা ও ধ্বংস করতে ইজরায়েলের জুড়ি মেলা ভার। এমনটাই ধারণা আই এস মহলে। তাই আর যে দেশই আক্রমণের তালিকায় থাকুক না কেন ইজরায়েলের পাঞ্জা নিতে এই কুখ্যাত বাহিনীও আতঙ্কিত বলেছেন এই পূর্বতন পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক।

জঙ্গি হানা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখতে হবে : হোসবালে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'পাঠানকোটে ভারতীয় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে পাক জঙ্গি হানা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক

শিবিরের উদ্বোধন করছেন ভাইয়াজী যোশী ও সুমিত্রা মহাজন।

বজায় রাখতে হবে।' ইন্দোরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আয়োজিত বিশ্ব সঙ্ঘ শিবিরের শেষ দিনে এক সাংবাদিক

দত্তাত্রেয় হোসবালে

সম্মেলনে সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান ভারতের অভিন্ন অঙ্গ ছিল। আমরা সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক যোগসূত্রেও অভিন্ন। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর আদর্শে পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। তাদেরও এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রেরণায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলা হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে পাঁচদিনের 'বিশ্ব সঙ্ঘ শিবির ২০১৬' শুরু হয় গত ২৯ ডিসেম্বর ইন্দোরে। শিবিরের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী যোশী) এবং লোকসভার অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজন। বিশ্বের ৪৫টি দেশ থেকে ৭৫০ জন প্রতিনিধি শিবিরে যোগ দিয়েছেন। শিবিরের শেষ দিনে গত ২ জানুয়ারি সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত প্রকাশ্য সমাবেশে ড. আম্বেদকরের উদ্ধৃতি টেনে বলেন, ''ড. আম্বেদকর বলেছেন— 'আমি ফরাসি বিপ্লব থেকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার শিক্ষা নিতে চাই না। আমি এসবের ধারণা পেয়েছি তথাগত বুদ্ধের জীবন থেকে। তিনি এদেশেই জন্মেছিলেন।' পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে সাম্য ও স্বাধীনতার সহাবস্থানের অভিজ্ঞতা নেই। তাদের কাছে এটা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু ভারতের কাছে এ দু'টো মেলানোর সহজ পথ হলো মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুভাব। এই বন্ধুভাবকে এখানে ধর্ম বলা হয়েছে।''

সি বি এফ সি পুনর্গঠনের রূপরেখা নির্মাণে শ্যাম বেনেগালের নেতৃত্বে কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেন্দ্রীয় সরকার প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্রবীণ শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনকে (সিবিএফসি) ঢেলে সাজার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে বিশিষ্ট আর এক পরিচালক গৌতম ঘোষ সাধুবাদ জানিয়েছেন। শ্রী ঘোষ বলেন, ফিল্ম সেন্সরসিপ নিয়ে বিতর্ক ও মতভেদ বরাবর রয়েছে। এটি এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকার ভেদ বা **perceptual difference** যা অনেকক্ষেত্রেই থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে ৮০'র দশকে নানান পুরস্কার জয়ী প্রখ্যাত সাহিত্যিক কমল মজুমদারের উপন্যাস অবলম্বনে তাঁর 'অন্তর্জলি যাত্রা' ছবিটির প্রসঙ্গ তোলেন। ঘোষ বলেন, সেন্সর কর্তৃপক্ষ তাঁর ছবিটিকে প্রথমে আদৌ ছাড়পত্র দেয়নি। ছবিটি প্রদর্শনের অনুমতি দূরস্থান, এর বিষয়বস্তুর জন্য

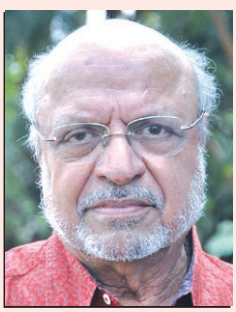

শ্যাম বেনেগাল

নিষিদ্ধ হতে চলেছিল। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ ও অন্যান্য বেশ কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তির অনুরোধে ছবিটির একটি বিশেষ ঘরোয়া প্রদর্শন হয় ও টালবাহানার পর ছবিটি ইউ-এ ছাড়পত্র পায়। শ্রী ঘোষ সেন্সরশিপ তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেন, ভারতের মতো নানা বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির দেশে চলচ্চিত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে ভয়ঙ্কর ফল হতে পারে। সারা দেশে পর্নোগ্রাফিক ছবির প্রদর্শন অস্বাভাবিক বাড়তে পারে। সম্প্রদায়গত দাঙ্গায় উস্কানিমূলক ছবি তৈরি করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত করার চেষ্টা হওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা। তাই তাঁর মতে সিবিএফসি-এর একটি নিয়ামক সংস্থা হিসেবে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি কমিটির সাফল্য কামনা করেছেন।

পুনায় আর এস এস-এর শিবশক্তি সঙ্গমে পূর্ণ গণবেশে উপস্থিত দেড় লক্ষ

শুধুমাত্র সংবিধান আমাদের সমতা এনে দিতে পারে না, এর জন্য মন ঠিক করতে হবে : ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'সংবিধান রচনার সময় ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন যে, আমাদের রাজনৈতিক একতা এসেছে, কিন্তু আর্থিক ও সামাজিক একতা ছাড়া তা স্থায়ী হতে পারে না। আর এর জন্য আমাদের সবার মন ঠিক করতে হবে।' গত ৩ জানুয়ারি পশ্চিম মহারাষ্ট্র প্রান্তের পুণেতে এক বিশাল স্বয়ংসেবক সমাবেশে কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, আমরা কোনো বিদেশি শত্রুর কারণে হেরে যাইনি, নিজেদের ভেদভাবের জন্য হেরেছি। ভেদভাব দূর করে একসঙ্গে যদি আমরা দাঁড়াতে না পারি তাহলে শুধুমাত্র সংবিধানের ধারার বলে সমরসতা আসতে পারে না। তা নিজের জীবনে আনতে হবে। গান্ধীজী মনে করতেন তত্ত্ব ছাড়া রাজনীতি, শ্রম ছাড়া সম্পদ, নীতি ছাড়া ব্যবসা, বিবেকশূন্য উপভোগ, চরিত্রহীনের জ্ঞান, মানবতা ছাড়া বিজ্ঞান ও ত্যাগ ছাড়া পূজা হলো সামাজিক অপরাধ। এজন্য তাঁর মতে পূর্ণ স্বাধীনতার এখনো বাকি আছে। সেই রকম পূর্ণ স্বাধীনতা, সমতা এবং বন্ধু ভাবাপন্ন সমাজের নির্মাণ করাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। আর এজন্যই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিম মহারাষ্ট্র প্রান্ত আয়োজিত এক দিনের এই শিবিরের নাম রাখা হয়েছিল 'শিবশক্তি সঙ্গম'। সঙ্ঘের ইতিহাসে এমন বিশাল শিবির এই প্রথম। সঙ্ঘের নির্ধারিত গণবেশে (ইউনিফর্ম) ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭২২ জন স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। বিশালতা ও বৈচিত্র্যে এই সমাবেশ ছিল অনন্য। সমাবেশের মঞ্চ ছিল ২০০ ফুট লম্বা ও ১০০ ফুট চওড়া। ৮০ ফুট মঞ্চে ওঠার জন্য ছিল লিফটের ব্যবস্থা। মঞ্চে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ৩৫ ফুট উঁচু প্রতিমূর্তি ছিল। ৪৫০ একর জায়গা জুড়ে হয়েছিল সমাবেশস্থল। ছিল ১৩টি প্রবেশ দ্বার। শিবাজী মহারাজের বিভিন্ন দুর্গের নাম অনুসারে প্রবেশ দ্বারগুলির নামকরণ করা হয়েছিল। মুখ্য দ্বার তোরনা ও রায়গড়ের অনুকরণে করা হয়েছিল। ১০০ জন শিল্পী ৩ মাস ধরে মঞ্চ নির্মাণ করেন। সমাবেশস্থলে ৭০ ফুট উঁচু ধ্বজদণ্ডে ২১ মিটার ধ্বজ ছিল। মঞ্চে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন মহাপুরুষের প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছিল। সমাবেশের প্রস্তুতি চলেছিল ৬ মাস ধরে। ২০০ একর জমির ওপর যানবাহন রাখার ব্যবস্থা ছিল। ২০০ জন চিকিৎসক ও ২০টি অ্যাম্বুলেন্স জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার জন্য তৎপর ছিল। দূর থেকে স্বয়ংসেবকদের বিশ্রামের জন্য ছিল ১৩টি শিবির। এক একটি শিবিরে ২০০০ জনের ব্যবস্থা ছিল। স্বয়ংসেবকদের দুপুরে ভোজনের জন্য পুনে ও পিমপরি দুটি জনপদের ১ লক্ষ বাড়ি থেকে খাবারের প্যাকেট এসেছিল। মুখ্যমন্ত্রী-সহ মহারাষ্ট্র সরকারের সমস্ত মন্ত্রী সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন। ১০ হাজার বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

এছাড়া ২ লক্ষ ৫০ হাজার স্থানীয় মানুষ এই সমাবেশ দেখতে এসেছেন।

সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত সমবেত নাগরিক ও অতিথি- অভ্যাগতদের আহ্বান জানান, শুধু নেতা বা সরকারের জন্য দেশ বড় হয় না, তাদের সঙ্গে চরিত্রসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। দেশ প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত না হলে ব্যক্তিগত সুখের কোনো দাম নেই। তাই সঙ্ঘের এই সমাজহিতের কাজে সবাই সক্রিয় হোন।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় নতুন নথি চাইলেন সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিজেপি নেতা সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীকে অভিযুক্ত করে উল্লেখিত মামলাটিতে দিল্লী ডেভেলপমেন্ট কর্তৃপক্ষ ও রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিকে দিল্লীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ন্যাশনাল হেরাল্ড বিল্ডিং ও এই সম্পত্তির উৎস সংস্থা এজেএল (অ্যাসোসিয়েটেড জার্নাল লিমিটেড) সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আদালতে পেশ করার জন্য আদেশ দেওয়ার আবেদন জানালেন দিল্লী উচ্চ আদালতের কাছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরে এই মামলায় বারবার অছিলায় তাঁদের ব্যক্তিগত হাজিরা না দেওয়ার অভিসন্ধি বানচাল হওয়ায় মাতা-পুত্র পাতিয়ালা হাউস কোর্টে হাজিরা দিতে বাধ্য হন।

আদালতে এড়িয়ে যাওয়ার এই প্রচেষ্টাকে তীব্র ভর্ৎসনার পর বিচারপতি তাঁদের হাজিরাকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন। আদালত অবমাননা ঠেকাতে তাঁরা প্রাথমিকভাবে দলবল নিয়ে হাজিরা দেন। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসভঙ্গ ও ঠগবাজির এই মামলার শুনানি আগামী ১১ জানুয়ারি হওয়ার কথা। আদালত বড় কঠিন ঠাঁই!

উবাচ

"পদ্ম-সম্মান এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে।"

অভিনেত্রী আশা পারেখের অনুরোধ প্রসঙ্গে।

নীতিন গড়করি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

"মানবতার শত্রুরা ভারতের উন্নতি সহ্য করতে পারে না।"

টুইটারে পাঠানকোটে জঙ্গি হামলা প্রসঙ্গে।

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

"বিহারের মন্ত্রী লালুপুত্র তেজপ্রতাপ যাদব ক্লাস সেভেন পাশ না হলেও তাঁর বাইকের দাম ১৫.৪৬ লক্ষ আর গাড়ির দাম ২৯.৪৩ লক্ষ টাকা।"

ড. নাসিম জাইদি
জাতীয় নির্বাচন কমিশনার

"চলচ্চিত্র সেনসর নিয়ে বিতর্ক সিনেমার জন্মলগ্ন থেকেই ছিল, আজও আছে।"

শ্যাম বেনেগাল
বিশিষ্ট প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক

ভারত-পাক সমঝোতা নিঃসন্দেহে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ

শনিবার, ২ জানুয়ারি। ভোর ৩-৩০ মিনিট। পাঠানকোটের বায়ুসেনার ঘাঁটি তখনও অন্ধকারে ঢাকা। সেই সাতসকালে অতর্কিতে শুরু হলো গুলির লড়াই। পাক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ- এর সন্ত্রাসবাদীরা হানা দিয়েছে ঘাঁটিতে রাখা ভারতের যুদ্ধ বিমান এবং হেলিকপ্টারগুলিকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিতে। লড়াই চললো টানা ১৭ ঘণ্টা। রীতিমতো পরিকল্পনা করেই জঙ্গিহানায় পাঁচজন আত্মঘাতী ফিদাইনকে ভারতে পাঠিয়ে ছিল জইশের মাথা মৌলানা আজহার। জঙ্গিদের পরনে ছিল ভারতীয় সেনা অফিসারদের উর্দি। রাতের আঁধারে আসল নকল বোঝা ভার। এই সেই মৌলানা আজহার যাকে কাশ্মীরে গ্রেপ্তারের পর ১৯৯৯ সালে ভারতীয় বিমান অপহরণকাণ্ডে ভারত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নিহত পাঁচজন জঙ্গি-ছাড়াও অন্য অনেক লোক এই হামলায় জড়িত আছে। পাক জঙ্গিরা কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে জম্মু সীমান্ত দিয়ে পাঞ্জাবে ঢুকেছিল। তাদের আশ্রয়দাতাদের খুঁজে বার করতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আইয়ের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া এই কাজ সম্ভব ছিল না। আবার পাক সেনাবাহিনীর সক্রিয় মদত ছাড়া আই এস আই অচল। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আই এস আই কর্তারা লস্কর-ই-তৈবা, বব্বর খালসা, জইশ-ই-মহম্মদ ও হিজবুল মুজাহিদ্দিন জঙ্গি গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে। এই বৈঠকে আই এস আই কর্তারা ভারত বিরোধী জঙ্গি নেতাদের বার্তা দেয় যে পাক সেনাবাহিনী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর সখ্য ভাল চোখে দেখছে না। ভারতের মিত্রতার হাত গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় কার্গিল যুদ্ধে। যতদিন ভারত শত্রুরাষ্ট্র থাকবে ততদিন পাক সেনা কর্তাদের অঙ্গুলি হেলনে পাকিস্তানের প্রশাসকরা চলবে। সেনা কর্তারাই দেশ চালাবে। এই কর্তাদের বড় ভয় যে তাদের দেশের জনসাধারণ যদি গণতন্ত্রের দাবি তোলে তবে সেনার ক্ষমতা চলে যাবে। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই গণতন্ত্র নেই। সাধারণ মানুষের ক্ষমতা ও অধিকার বলতেও কিছুই নেই। গণতন্ত্রের মোড়কে পাকিস্তানের সেনা কর্তারাই দেশ চালায়। এই কর্তারা চায় না যে ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতি হোক। পাক সেনা এবং আই এস আইয়ের

গূঢ়পুরুষের কলম

প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া পাঠানকোটে বায়ুসেনার ঘাঁটিতে এমন হামলা সম্ভব নয়। ভারত বিরোধী সন্ত্রাসে আই এস আই সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে এমন অভিযোগ প্যারিসের জলবায়ু দূষণ রোধের বৈঠকের ফাঁকে একান্ত আলাপচারিতায় পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। শরিফ স্বীকার করেন যে আই এস আইয়ের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি সেনার হাতে। পাক প্রশাসন দর্শক মাত্র। সোজা কথায়, পাক-প্রধানমন্ত্রীকে আই এস আই পাত্তা দেয় না। পাক-প্রধানমন্ত্রী কতদিন তাঁর পদে থাকবেন তা নির্ভর করে সেনা প্রধানের মর্জির উপর।

১৫ জানুয়ারি ইসলামাবাদে পাক-ভারত বিদেশ সচিবদের বৈঠক হবে। এই বৈঠক বানচাল করতেই পাঠানকোটে জইশ-এর জঙ্গিরা হামলা চালিয়ে ছিল। আমার মনে হয় এটা একটা ফাঁদ। বাজপেয়ীর আমলে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক ভেস্তে দিতে তখনকার পাক সেনা প্রধান পারভেজ মুশারফ কার্গিল যুদ্ধ শুরু করেছিল। হ্যাঁ, সেটাও ছিল একটা পাক সেনার ফাঁদ। বিজেপি-র বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতি অসহিষ্ণুতার অভিযোগ আনাটা এখন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন ইসলামাবাদের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক গড়তে প্রথম উদ্যোগী হন বিজেপি প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। বর্তমানে নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী থেকে মনমোহন সিং কেউই ইসলামাবাদের সঙ্গে সখ্য চাননি। অথচ বিজেপি নাকি মুসলমান বিরোধী। আর কংগ্রেস পাক প্রেমী। সহিষ্ণুতার অবতার। আশার কথা পাক প্রশাসন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে ভারত-পাক সম্প্রীতির আবহাওয়া ধরে রাখতে পাকিস্তান বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ পাক সেনা—আই এস আই-জুটি যে ভারত বিরোধী ফাঁদ পেতেছে সে সম্পর্কে পাক প্রশাসন ওয়াকিবহাল। আর এস এস-এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসবালে সঠিকভাবেই বলেছেন যে মোদীজীর লাহোর সফর মোটেই অনুচিত ছিল না। ''আমরা মনে করি অন্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করাটা আমাদের কর্তব্য।''

একটা প্রশ্ন শুনতে হচ্ছে যে পাক জঙ্গিরা কেন জম্মু-কাশ্মীরের পদাতিক সেনা ছাউনির সহজ টার্গেটের পরিবর্তে পাঠানকোটের বায়ুসেনার শক্ত ঘাঁটি বেছে নিয়েছিল। কারণ, আই এস আই গোয়েন্দারা হানাদার জঙ্গিদের মগজ ধোলাই করে বুঝিয়ে ছিল যে ২০১১ সালে পাকিস্তানের মেহরানে এবং ২০১২ সালে কামরায় পাক বিমানঘাঁটি ধ্বংস করেছিল যে জঙ্গিরা তারা ভারতেরই এজেন্ট ছিল। অথচ সেই জঙ্গিহানার দায় নিয়েছিল আফগান তালিবানরা। পাকিস্তানে মার্কিন সেনাদের ঘাঁটি গাড়তে দেওয়ার প্রতিবাদে। মার্কিন বিমান ও ড্রোন হামলায় আফগান তালিবানদের তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। তাতে কী হয়েছে। পাকিস্তানে যা কিছুই ঘটুক না কেন সেখানে প্রচার করা হয় ঘটনার পিছনে ভারতের চররা আছে। হাঁ, এইভাবেই পাক সেনা—আই এস আই জুটি পাকিস্তানে ভারত-বিরোধী জিগির জিইয়ে রেখেছে। পাকিস্তানে গণতন্ত্র নেই। তাই সেখানের সাধারণ মানুষের মতামত জানা যায় না। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী অকপটে স্বীকার করেন যে আই এস আই এবং সেনা-প্রধানরা তাঁর নিয়ন্ত্রণে নেই সেখানে ভারত-পাক সমঝোতা নিঃসন্দেহে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ।

এদেশে প্রগতিশীল তকমাধারীরাই বেশি সাম্প্রদায়িক

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

ইদানীংকালে 'সাম্প্রদায়িকতা' ও 'সাম্প্রদায়িক' কথা দুটো তাৎপর্য ও অর্থ হারিয়ে ফেলেছে বহু ব্যবহারের ফলে। এখন এগুলো নিন্দাসূচক কথা। কিছু রাজনৈতিক নেতা ও স্ব-ঘোষিত বুদ্ধিজীবী এগুলো ব্যবহার করেন অজ্ঞতার কারণে অথবা রাজনৈতিক স্বার্থে। ড. বিপান চন্দ্র মনে করেন, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিপরীতধর্মী ব্যাপার। তাঁর মতে, অনেক নেতাও এই ভুল করেছেন— সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের লড়াইটা তাই তেমন জোরালো হয়নি— ('আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িকতা', সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা, পৃ. ৫৮-৫৯)।

কিন্তু প্রথম কথা— সাম্প্রদায়িকতা অদ্ভুত বা অন্যায় কিছু নয়— এটা মানুষের সহজাত বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকেই এসেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ঊষারঞ্জন চক্রবর্তীর মতে, 'সম্প্রদায় থাকলে সাম্প্রদায়িকতাও নিশ্চয় থাকবে— সেটা হলো অত্যন্ত মানবিক প্রবৃত্তি।' তিনি বলেছেন— যাঁর চিন্তা, ভাবনা, কর্ম প্রভৃতি নিজ নিজ সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক, তাঁকেই সাম্প্রদায়িক বলা যায়— (প্রসঙ্গ গণতন্ত্র, রাজনীতি ও ধর্ম, পৃ. ৩৬-৩৭)। শুধু দেখতে হবে এই প্রকৃতি তাঁকে অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষ এনে দিয়েছে কিনা।

ধরা যাক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা। বিজ্ঞানীর মন দিয়ে তিনি ধর্মসাধনা করেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছেন ধর্মসমন্বয়ের কথা। তিনি হিন্দু ভক্ত হয়েও শম্ভুচরণ মল্লিকের কাছে বাইবেল শুনেছেন। যদু মল্লিকের বাগান বাড়িতে যীশুখৃষ্টের ছবি দেখে তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে আপ্লুত হয়েছেন— 'He became gradually overwhelmed with divine emotion'—(Swami Nikhilananda– Sri Ramakrishna, পৃ. ৫৬)। তাঁর মনে হয়েছে এটাও একটা পথ। আবার গোবিন্দ রায়ের কাছ থেকে 'আল্লামন্ত্র' নিয়েছেন— ইসলাম ধর্ম আইনে তিনি কয়েকদিন বিভোর ছিলেন। মুসলমান পাচকের নির্দেশে এক ব্রাহ্মণ পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে তখন তাঁর রান্না করতেন। তিনদিন কাটানোর পর তাঁর মনে হয়েছিল সেটাও একটা পথ--- (স্বামী তেজসানন্দ— শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, পৃ. ৯৫)। আর স্বামী সারদানন্দ তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলালী প্রসঙ্গ, পৃ. ২৩৯) লিখেছেন, এই সময় তিনি কালীবাড়িতেও যেতেন না, থাকতেন মথুরামোহনের কুটিতেই। আসলে, সাধু-ভক্তের কথা শুনলেই তিনি দেখা করতে যেতেন, তেমনি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বাউল, আউল, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান সবাই যেতেন তাঁর কাছে। তাঁদের সবাই ভাবতেন তিনি তাঁদেরই লোক। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন খাঁটি হিন্দু— তখনও তিনি মা কালী ও কৃষ্ণ নামে কেঁদেছেন। তিনি বলতেন, ''হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম— এটা বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।''

তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসম্মেলনে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্যের কথা বললেও এটাই যে শ্রেষ্ঠ— সেই কথা বলেননি। বরং তিনি শেষ ভাষণে (২৭.১.১৪) বলেছেন— 'বিবাদ নয়— সহায়তা, বিনাশ নয়— ভাবগ্রহণ, বিরোধ নয়— সমন্বয় চাই'— (সঙ্কর্ষণ মাইতি— 'আমেরিকায় তাঁর ভাষণ, প্রেক্ষাপট, পুজোসংখ্যা, ১৪২২)। কিন্তু তিনিও স্বধর্ম ত্যাগ করেননি। তাঁর পরে স্বামী অভেদানন্দ দুই দশক বেদান্ত প্রচার করেছেন আমেরিকায়। কিন্তু তিনিও কি সাম্প্রদায়িক?

কিন্তু আমাদের মেকি উদারপন্থী ও প্রগতিশীলরা এই শব্দের অর্থ এখনও বোঝেননি। তাঁরা মনে করেন, হিন্দু হওয়ার অর্থ হলো ধর্ম-বিদ্বেষ, সুতরাং হিন্দুমাত্রই সঙ্কীর্ণচিত্ত ও সাম্প্রদায়িক। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ সোমনাথ মন্দিরে গিয়েছিলেন, বারাণসীতে সাধুদের পা ধুইয়ে দিয়েছেন— এতে নেহরু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদী বারাণসী মন্দিরে গিয়েছিলেন শপথ গ্রহণের আগে— সেটা নিয়েও অনেক সমালোচনা হয়েছে। তাহলে যেকোনো পদাধিকারীকে স্বধর্ম ত্যাগ করতে হবে?

দ্বিতীয়ত, আসলে হিন্দু শব্দটাই তাঁদের মধ্যে একটা 'অ্যালার্জি' সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে, প্রাচীনকালে আর্যরা সিন্ধুনদের তীরেই বসতিস্থাপন করেন— বিদেশিদের সঙ্গে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়। সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দ থেকে 'হিন্দু' কথাটা এসেছে— গ্রীক্ ভাষায় এটা হয়েছে 'ইন্ডিয়া', পার্সী ও আরবি ভাষায় হিন্দ্— (রামশরণ শর্মা--- ভাষান্তর --- সুমন চট্টোপাধ্যায়— প্রাচীন ভারত, পৃ. ২)। মজুমদার রায়-চৌধুরী-দত্তের লেখায়ও পাই— 'The major part of this area came to be known as Sapta Sindhu—the land of seven rivers'— (A Advanced History of India, পৃ. ২৮)। এভাবেই একটা জাতিগঠন হয়েছে। এই জাতিসত্তাই 'হিন্দু' নামে পরিণত হয়েছে। তাই ভারতের অপরনাম 'হিন্দুস্থান', পর্বতের নাম 'হিন্দুকুশ', রাষ্ট্রীয় চেতনার অভিবাদন মন্ত্র হলো 'জয়হিন্দ্'। আমাদের সুপ্রিম কোর্টও জানিয়েছে 'হিন্দু' কথাটা নিন্দনীয় নয়— এটা হলো 'a way of life or a state of mind and is not to be equaled with or understood as religious findamantalism' (১১.১২.৯৩)।

তৃতীয়ত, ওইসব 'প্রগতিশীলরা' 'সেকুলারিজম্' শব্দটারও অপব্যাখ্যা করেছেন। ইউরোপে মধ্যযুগে রাজার ক্ষমতা ছিল সীমিত। ধর্মজগৎকে নিয়ন্ত্রিত করতেন রোমের পোপ্ ও তাঁর অনুচর যাজকেরা। তাঁরা জাগতিক ব্যাপারেও কর্তৃত্ব করতেন। এর বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার, ক্যাল্‌ভিন্, অষ্টম হেনরি প্রমুখ ব্যক্তি গর্জে উঠলে পোপ্ ও যাজকদের প্রতিপত্তি খর্ব

হয়ে যায়। ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্ত রাজশক্তির প্রাধান্য 'সেকুলারিজম্'-কে চিহ্নিত করেছে--- (সীতারাম গোয়েল--- 'সেকুলারিজম্' পৃ. ২০)।

কিন্তু প্রগতিশীলরা এর অর্থকে বিকৃত করেছেন নানা স্বার্থে। তাঁদের কাছে এটা হলো হিন্দু-বিরোধিতা। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো— (১) রাষ্ট্র কোনো ধর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না; (২) কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত বা বিদ্বেষ দেখাবে না; (৩) ধর্মের জন্য কোনো ব্যক্তিকে বাড়তি সুযোগ দেবে না; এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোনো ধর্মাবলম্বীর প্রতি পক্ষপাত দেখাবে না— (Dr. M.V. Pylee–India's Constitution, পৃ. ১২৩)। কিন্তু এই সব প্রগতিপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের অর্থে বোঝেন হিন্দু-বিরোধিতা। একটা পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে ছিল--- 'সেকুলারিজমের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে।' বোঝা গেল— 'সেকুলারিজ্‌ম্' ও 'হিন্দুত্ব' শব্দদুটোর কোনটাই সম্পাদকমশাই বোঝেননি। কারণ এরা পরস্পর-বিরোধী কথা নয় আদৌ।

চতুর্থত, এঁরা মুসলমান-সম্প্রদায় চাকরি, ব্যবসায় প্রভৃতি ব্যাপারে পিছিয়ে আছেন বলে নাকি-কান্না গেয়ে থাকেন। অবশ্যই তাঁরা পিছিয়ে আছেন— কিন্তু তার পেছনে আসছে একটা ঐতিহাসিক কারণ।

মুসলমান শাসককে হঠিয়ে দিয়েই ইংরেজরা এই দেশে ঘাঁটি গেড়েছিল। ড. নিমাইসাধন বসু লিখেছেন, এই কারণে ওই সম্প্রদায় ইংরেজি সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্বেষ পোষণ করত— 'It was Muslim rule which the British Supplanted. The introduction of Secular English education and the replacement of parsian by the English education naturally hurt their pride. (The Indian National Movement, পৃ. ৭২)। যার ফলে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ যখন দেশে যখন এসেছে, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ গুণীজনের প্রেরণায় হিন্দুরা সেটা গ্রহণ করেছেন— মুসলমান সম্প্রদায় পড়েছে পিছিয়ে। দেব চন্দ্র ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন, 'Consequently, modern western thought... did not spread among Muslim intelleactuals who remained traditionally backward'– (Freedom Struggle, পৃ. ১০৫)। অনেক পরে সৈয়দ আমেদ খাঁ প্রমুখের চেষ্টায় ওই সম্প্রদায়ও ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গেছে— আরবি, ফার্সী, উর্দু নিয়ে আধুনিককালে প্রতিযোগিতামূলক চাকরি-পরীক্ষায় সফল হওয়া যায় না, ব্যবসাও তেমন চলে না।

তার মধ্যেও জানাই— এই পর্যন্ত চারজন মুসলমান আমাদের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, উপরাষ্ট্রপতি হয়েছেন চারজন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন চারজন, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে বিচারক হয়েছেন বেশ কয়েকজন। চিফ্ এয়ার মার্শাল হয়েছেন ইদ্রিস লতিফ। শিক্ষক, নেতা হয়েছেন অনেকে। চলচ্চিত্র, সঙ্গীত ও ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্থ ও সম্মান পেয়েছেন বহুজন। এই ধরনের সুযোগ কয়জন হিন্দু পেয়েছেন পাকিস্তান বা বাংলাদেশে?

পঞ্চমত, তাঁদের কেউ কেউ 'বিপ্লবী' সাজতে গিয়ে প্রকাশ্যে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে গো-মাংস খেয়েছেন। খাওয়া ও পরা ব্যক্তিগত ব্যাপার— এই নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু এই নিয়ে মিথ্যাচার ও তথ্য-বিকৃতি কেন? তারা বলেন, বেদে গো-মাংস খাওয়ার কথা বলা আছে— মুনি-ঋষিরাও নাকি গো-মাংস খেতেন।

এটা ঠিক যে, 'গোমেধ' যজ্ঞের কথা আছে। কিন্তু সেটা গোরুর হত্যা বা গো-মাংস খাওয়া নয়— গো-জাতিকে পুষ্ট করা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রাক্তন প্রধান ড. সীতানাথ গোস্বামী মনে করিয়ে দিয়েছেন, এটা আছে মনুসংহিতায় (৩/৭০)। তিনি আরও লিখেছেন, 'ঋগ্বেদে গো-হত্যা বা গো-মাংস ভক্ষণের কথা বলা হইয়াছে বা ঋষিগণ গো-মাংস ভক্ষণ করিতেন, এই রূপ কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞতার জন্যই অনেকে বলিয়া থাকেন— ('বেদে গো-হত্যা বা গো-মাংস ভক্ষণের নির্দেশ নেই', স্বস্তিকা, ৩০.১১.১৫)। তিনি আরও জানিয়েছেন, মহাভারতে তো গো-হত্যা নিষিদ্ধ আছে। আর স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে গো-জাতির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

পরিশেষে অন্য একটা কথা বলি। মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের কথা ভেবে অনেক নেতাই তোষণের রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছেন। এটা চলে এসেছে নেহরু-ইন্দিরা গান্ধীর যুগ থেকে। শাহবানো মামলার রায়কে নস্যাৎ করার জন্য রাজীব গান্ধী আইন সংশোধন করেছিলেন।

মুলায়ম সিং, লালুপ্রসাদ যাদব প্রমুখ নেতাও একই পথ নিয়েছেন। মনমোহন সিং একবার বলেছেন— এই দেশের সম্পদের ওপর প্রথম অধিকার সংখ্যালঘুদের। তিনি ইমামদের ভাতা দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধদেববাবু কিন্তু মাদ্রাসা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেও পরে বলেছেন, তাঁর সরকারই অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় মাদ্রাসার জন্য বেশি টাকা দেয়।

ষষ্ঠত, বাবরির ধাঁচার ব্যাপারে ওই ধরনের নেতারা বেশি চেঁচামেচি করেছেন— বিজেপি শাসিত চারটে রাজ্যেই রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করা হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেন— সেটা ছিল হিন্দু মন্দির। ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'বাবর অযোধ্যা বিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যার মন্দির ধ্বংস করেন ও তাহার উপর মসজিদ নির্মাণ করেন'— (ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯)। অনুরূপভাবে কে. এস. লাল মন্তব্য করেছেন, 'In 1528-29 Mirbaki, a Mughal Commander, by Babar's order destroyed his temple at Ayodhya... and built a mosque in its place– (Muslim state In India, পৃ. ৬৫৬)। অথচ বিজেপি ও তার সঙ্গীদের মস্‌জিদ ধ্বংসের কারণে নিন্দা করা হয়েছিল এবং প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাশ্মীর ও অন্যত্র বহু মন্দির ভাঙা হয়েছিল।

যদিও আমাদের সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে সকলের জন্য একই ধরনের আইন প্রণয়ণের নির্দেশ দেওয়া আছে, ওই সম্প্রদায়ের বিরূপতার ফলে আজ পর্যন্ত সেটা কার্যকরি করা যায়নি। তাঁরা প্রশ্ন করেন— অনুপ্রবেশকারী ও হিন্দু শরণার্থীর মধ্যে পার্থক্য করা হয় কেন? একবার সিপিআই-এর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন— একই বেশ, একই চেহারা এবং একই মাতৃভাষা— তাহলে পাসপোর্ট- ভিসা কেন? জার্মানিতে কিন্তু এর জন্য 'বার্লিন-প্রাচীর' দিতে হয়েছিল। এই সব কারণে বলা যায়--- এই দেশে যাঁরা 'প্রগতিশীল' সেজেছেন, তাঁরাই বেশি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। ■

সামাজিক সমতা ও সেবাকাজের মূর্ত-পুরুষ বালাসাহেব দেওরস

সুকেশ মণ্ডল

চেন্নাই অভিমুখী বিমান। অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ৮০ বছর বয়স্ক একজন যাত্রী। পক্ষাঘাতগ্রস্ত। স্পষ্টভাবে কথা বলার ক্ষমতাও নেই। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে হুইল চেয়ারে তোলা হয়েছে। বিমানসেবিকা বার বার তাঁকে দেখছেন। ভাবছেন তাঁকে বুঝি চেন্নাইয়ে ভালো চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চেন্নাইয়ে অবতরণের একটু আগে বিমানসেবিকা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন? উত্তর পেলেন, 'না না, আমি কোনো হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছি না। চেন্নাইয়ে আমার কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুর বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি নাগপুর থেকে আসছি।' বিমান সেবিকা বিস্মিত। যাঁর শরীরের অবস্থা এত সঙ্গিন, যে কোনো সময়ে কিছু হয়ে যেতে পারে, এরকম অবস্থায় তিনি যাচ্ছেন অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়াতে। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? উত্তর পেলেন, 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক অর্থাৎ সংগঠনের অভিভাবক। বিমান অবতরণের পর যখন তাঁকে আবার হুইল চেয়ারে বসানো হলো তখন বিমান সেবিকা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'আপনি সত্যিই মহাত্মা। এই বয়সে, এই অবস্থায় এত কষ্ট করে আপনি অন্যের দুঃখের সহভাগী হতে যাচ্ছেন, আমি আমার জীবনে এমন দেখিনি। আপনি সত্যিকারের মহাপুরুষ।'

সামাজিক সমরসতা এবং বঞ্চিত, পীড়িত, অবহেলিত, শোষিত সমাজ ও মানুষের উত্থানের জন্য সারাদেশে সেবাকাজ বিস্তারিত করাকে জীবন-লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরস উপাখ্য বালাসাহেব দেওরস। সেবাকাজের দ্বারা সামাজিক উত্থানের পুরোধাপুরুষ রূপে তিনি আজ পরিচিত। বাল্যকাল থেকে জীবনের অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত সমাজের কুরীতি, বিষমতা, দারিদ্র্য দূর করার জন্য তিনি এক সেবা শৃঙ্খল নির্মাণ করেছেন। সেই যোজনা কার্যান্বিত করার জন্য লোক নির্মাণ করে সমাজকে আহ্বান করেছেন, জাগ্রত করেছেন। ১৯৭৪ সালে পুনায় এক নাগরিক সমাবেশে যা বসন্ত ব্যাখ্যামালা নামে পরিচিত, বলেছেন— ''আমাদের সবার মন থেকে সামাজিক ভেদভাব দূর করার লক্ষ্য অবশ্যই থাকা চাই। আমাদের সবার পরিষ্কারভাবে জানা উচিত যে, ভেদভাবের কারণে আমাদের সমাজে কী প্রকার দুর্বলতা এসেছে এবং এর ফলে সমাজ কীভাবে নষ্ট হয়েছে। একে দূর করার চেষ্টায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে।'' ১৯৮৯ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মশতাব্দীবর্ষে তাঁর আহ্বানে সারা দেশে যে সেবা শৃঙ্খল রচিত হয়েছে তাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি দেশবাসীর সম্মান ও শ্রদ্ধা নির্মাণ হয়েছে।

১৯১৫ সালে নাগপুরে তাঁর জন্ম হয়। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরে তিনি ডাঃ হেডগেওয়ারের সম্পর্কে আসেন ও স্বয়ংসেবক হন। নাগপুরের মোহিতেওয়াড়ে শাখার স্বয়ংসেবক তিনি। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতার প্রেরণায় তিনি সারা জীবন রাষ্ট্রসেবায় দেওয়ার মনস্থির করেন। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির নির্মাণ, কার্যক্রমের বিকাশে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। গণবেশ, শারীরিক ও বৌদ্ধিক কার্যক্রম, গণগীত ইত্যাদি নিশ্চিত করায় তিনি প্রধান ভূমিকায় ছিলেন।

প্রখর বুদ্ধিমান বালাসাহেব ছাত্রজীবনে সমস্ত পরীক্ষায় প্রথমস্থান লাভ করেন। পড়াশুনা শেষ করে তিনি নাগপুরেই 'অনাথ বিদ্যার্থী বসিত গৃহ' নামে এক বিদ্যালয়ে দু' বছর নিঃশুল্ক শিক্ষকতা করেন। এই সময়ে তিনি নাগপুর নগর কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেন। তখন তিনি শাখা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শীত শিবির, বনভোজন, সহভোজ এবং স্বয়ংসেবকদের গুণাত্মক বৃদ্ধির জন্য নৈপুণ্যবর্গ ইত্যাদির প্রচলন করেন।

তিনি বাল্যকাল থেকেই খোলা মনের মানুষ ছিলেন। সে সময়ে সমাজে প্রচলিত ছোঁয়াছুঁয়ি, খাওয়া-দাওয়া, জাতিভেদ ইত্যাদির তিনি প্রবল বিরোধী ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে তাঁর সব শ্রেণীর বন্ধুরা আসতেন। সবাই একসঙ্গে খেতেন। বিশেষ বিশেষ দিনে শাখার বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে রান্নাঘরে বসেই খেতেন। তাঁর এরকম কাজকর্মে প্রথম প্রথম বাড়িতে বকা খেতেও হয়েছে। কিন্তু

পরে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। তাঁর মন থেকে বলা কথাটি এখন আপ্তবাক্যের মতো হয়ে আছে--- 'অস্পৃশ্যতা যদি পাপ না হয়, পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই।' মোহিতেওয়াড়ে শাখার 'কুশপথক'-এর স্বয়ংসেবক ছিলেন। পথককে এখন গট বলা হয়। এই গটে প্রতিভাবান ছাত্রদেরই রাখা হোত।

১৯৩৯ সালে বালাসাহেব বাংলার প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় আসেন। কিন্তু ১৯৪০ সালে ডাক্তারজীর মৃত্যুর পরে তাঁকে নাপুরে ডেকে নেওয়া হয়। ছ' মাসের মধ্যেই বাংলায় সঙ্ঘকাজের গোড়াপত্তন করে দিয়ে যান। ১৯৪০-এর পর প্রায় ৩২ বছর তাঁর গতিবিধির কেন্দ্র নাগপুরকে কেন্দ্র করেই ছিল। তিনি নাগপুরের সঙ্ঘকাজ সারা দেশের সামনে আদর্শরূপে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সঙ্ঘের প্রাতঃস্মরণে আমাদের রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পরম্পরার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রাখা হয়েছিল। প্রথমে হিন্দুধর্মের পরম্পরা গুলিকেই শ্লোকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বালাসাহেব দেওরসের পরামর্শে তাতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্মের মানবিন্দুগুলিকে যুক্ত করা হয়। ভারতের উন্নতির জন্য যা কিছু মঙ্গলজনক সবই তাতে সে সময় সন্নিবিষ্ট করা হয়। সারা ভারতকে একসূত্রে বাঁধার উদ্দেশ্যে রচিত এই শ্লোকগুলিকে তাঁর ইচ্ছানুসারে এখন একাত্মতা স্তোত্রম্ বলা হয়।

লোক সংস্কারের কেন্দ্র সঙ্ঘ শাখার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তিনি সমাজের সামনের অতি সরল ভাষায় রেখেছেন : ''সঙ্ঘের শাখা কেবল খেলধুলা বা কুচকাওয়াজ করার স্থান নয়, আড়ম্বরহীন ভাবেই সজ্জনদের সুরক্ষার অভিব্যক্তি, তরুণ-যুবকদের কু-অভ্যাসাদি থেকে মুক্ত রাখার সংস্কারপীঠ, সমাজের ওপর আগত আকস্মিক বিপত্তি বা সঙ্কটে দ্রুত ও পক্ষপাতহীন সহায়তা দানের আশাকেন্দ্র, মহিলাদের নির্ভয়তা এবং সুসভ্য আচরণ প্রাপ্তির আশ্বাসস্থল, দুষ্ট ও দেশদ্রোহী শক্তির ওপর নিজ প্রভাব স্থাপনকারী শক্তি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ্য কর্মী যাতে পাওয়া যায় তার প্রশিক্ষণ দানকারী বিদ্যাপীঠ হলো সঙ্ঘশাখা।''

তখন সারা দেশের সঙ্ঘশিক্ষাবর্গে নাগপুর থেকে শিক্ষক পাঠানো হোত। নাগপুর থেকে বেরিয়ে প্রচারকরা সারা দেশে শাখা দাঁড় করিয়েছেন। প্রচারকরূপে সারা দেশে পাঠানোর জন্য প্রচারকদের একটি বাহিনী নির্মাণের শ্রেয় সর্বতোভাবে বালাসাহেবজীরই প্রাপ্য। শুধু তাই নয়, যে প্রচারকদের দেশের অন্যপ্রান্তে পাঠানো হচ্ছে তাদের বাড়ির সমস্ত বিষয়ে চিন্তাভাবনা তিনিই করতেন। এছাড়া যে প্রচারকরা ৫ অথবা ১০ বছর কাজ করে ফিরে আসতেন তাদের চাকরি-বাকরি, ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্বও তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। নাগপুর থেকে যে প্রচারকদের দল সারা দেশে পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে তাঁর ভাই ভাউরাও দেওরসও ছিলেন। ভাউরাও লখনউ-য়ে সঙ্ঘকাজে গতি প্রদান এবং একাত্ম মানবদর্শনের প্রণেতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো মানুষদের সঙ্ঘকাজে যুক্ত করেন।

১৯৬৫ সালে সরকার্যবাহ এবং শ্রীগুরুজীর প্রয়াণের পর ১৯৭৩ সালে সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর কুশল নেতৃত্ব, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সমাজের প্রতি প্রেম লক্ষ্য করে শ্রীগুরুজী একবার কোনো কার্যক্রমে তাঁর পরিচয় করাতে গিয়ে বলেছিলেন, ''সঙ্ঘের মধ্যে দু'জন সরসঙ্ঘচালকের পদ যদি থাকতো তাহলে নিঃসন্দেহে এই যুবক আর একজন সরসঙ্ঘচালক হতেন।'' সরসঙ্ঘচালক হয়ে বালাসাহেবজী সঙ্ঘকাজে গতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সারা দেশে ভ্রমণ করেন। তাঁর সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব গ্রহণের দু'বছর পরেই ১৯৭৫ সালের ৪ জুলাই ইন্দিরা গান্ধী ঘৃণ্য রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সে সময় সঙ্ঘের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা তিনি ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। তাঁকে ২১ মাস পুনের যারবেদা জেলে বন্দী রাখা হয়। জেলের মধ্যে তাঁর উদার চিন্তাভাবনা ও ব্যবহারে বন্দী থাকা অনেক রাজনৈতিক দলের কার্যকর্তা ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি সঙ্ঘের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর প্রেরণাতেই কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা বাদে বহু সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলের কার্যকর্তারা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শক্তিশালী সত্যাগ্রহ করেন। পরিণামস্বরূপ সঙ্ঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে স্বৈরাচারী ইন্দিরা সরকার তথা কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় হয়। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর পুত্র সঞ্জয় গান্ধীও নির্বাচনে হেরে যান। সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। সরসঙ্ঘচালক হওয়ার পর তিনি কার্যকর্তাদের 'দেবদুর্লভ' বলে উল্লেখ করেছেন। জরুরি অবস্থায় তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। তবু যোজনাবদ্ধভাবে স্বয়ংসেবকরা সত্যাগ্রহ করে বিভিন্ন জেলে যাচ্ছেন। জেলের মধ্যে অনুশাসনবদ্ধ কার্যক্রম চলছে। বাইরে জনসঙ্ঘর্ষ সমিতির নামে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। এসবেরই নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ংসেবকরা। অন্য দলের নেতারা জেলের মধ্যে বালাসাহেবকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি তো জেলের মধ্যে, এত সুচারুভাবে এসব কীভাবে

"সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষদের জন্য যে সেবাশৃঙ্খলের যোজনা তৈরি করে দিয়ে গেছেন তা আজ সারা ভারতে বিশাল আকার ধারণ করেছে। সেই সেবাপুরুষের প্রেরণাই আজ ভারতে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত পঞ্জীকৃত সেবা প্রকল্পের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫২ হাজার। তবু যতক্ষণ দেশের শেষ সারির শেষ মানুষটির কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া না যাচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর আত্মা অতৃপ্তই থেকে যাবে।"

চলছে? বালাসাহেবজী তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওরা তো একজন সরসঙ্ঘচালককে গ্রেপ্তার করেছে। বাইরে চারজন সরসঙ্ঘচালক নেতৃত্ব দিচ্ছেন।' কী অপূর্ব বিশ্বাস!

১৯৮৩ সালে তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরমে একদিনে কয়েক হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করা হয়। এই ঘটনা দেশের হিন্দুদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য বালাসাহেবজী পথনির্দেশে 'একাত্মতা যাত্রা' বের করা হয়। এ সময় লক্ষ লক্ষ হিন্দুজনতা ভারতমাতা ও গঙ্গাজলের নামে একত্রিত হয়। হিন্দুদের মনোবল বেড়ে যায়। এই যাত্রার মাধ্যমে দেশে অভূতপূর্ব জনজাগরণ হয়।

সবাই জানেন, শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনে দেশে হিন্দুশক্তির এক অপূর্ব রূপ দেখা গেছে। এই আন্দোলনে দেশের প্রায় সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন যুক্ত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ স্বাভিমানী হিন্দুজনতা ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর শ্রীরামজন্মভূমির ওপর কলঙ্কিত বাবরি ধাঁচা হটিয়ে দেয়। এরপর দেশ ও বিদেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দল ও মুসলমান মৌলবাদীরা হাওয়া গরম করতে থাকে। আজও তাদের ধ্বংস হওয়া বিতর্কিত ধাঁচার জন্য মায়াকান্না কাঁদতে দেখা যায়। কিন্তু সেই সময় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, যখন শ্রীরামজন্মভূমিতে এক বিতর্কিত ধাঁচা ভেঙে ফেলা হলো তখন সারা দুনিয়ার মুসলমানরা 'হায় তোবা, হায় তোবা' চিৎকার করছেন। কিন্তু যখন হিন্দুদের অগণিত মঠ-মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, সম্পদ লুঠ করা হয়েছে, তখন হিন্দুদের কত দুঃখ হয়েছে, মুসলমান সমাজ কি এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছে?

সেই সময় সঙ্ঘ চাইলে শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ করতে পারতো। কিন্তু বালাসাহেবজীর যুক্তি ছিল, তাহলে লোকের মনে হতো এই মন্দির সঙ্ঘ অথবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। তিনি মনে করতেন, অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির নির্মাণে সবার অংশগ্রহণ হওয়া উচিত। এই দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির ও রাজনৈতিক দলের শ্রীরামমন্দির নির্মাণে এগিয়ে আসা উচিত।

সরসঙ্ঘচালক থাকার সময় বালাসাহেবজী সঙ্ঘকাজের বহুমুখী বিস্তার ঘটান। তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বস্তিতে চলা সেবাকাজ। এর ফলে সেখানে ধর্মান্তরণ বন্ধ হয়েছে। স্বয়ংসেবকরা স্থানীয়ভাবে বহু সেবা সংগঠন শুরু করেছেন। বালাসাহেবজী প্রবীণ প্রচারকদের ওই সংগঠনের দায়িত্ব দিয়ে তার অখিল ভারতীয় রূপ দিয়েছেন। তাঁর কার্যকালেই মহকুমা পর্যন্ত শাখার বিস্তার হয়। সঙ্গে আনুষিক সংগঠনেরও পর্যাপ্ত শক্তি বৃদ্ধি হয়।

১৯৮৮-'৮৯-এ সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা তথা আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষ পালন করা হয়। এ সময় ডাক্তারজীর জীবনী গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হয়। এই সময়েই তাঁর আহ্বানে সর্বাধিক প্রচারক সঙ্ঘকাজের জন্য বের হয়। বঙ্গপ্রদেশেও ১০০ জন তরতাজা শিক্ষিত যুবক প্রচারকরূপে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন সঙ্ঘের প্রান্তস্তর অথবা বিবিধক্ষেত্রের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিই সমাজে 'হিন্দু জাগে তো বিশ্ব জাগেগা' এবং 'নর সেবাই নারায়ণ সেবা'-র মতো কথা চালু করেন। এই কথা শুধু স্লোগানে না থেকে কাজে পরিণত হয়েছে। তিনি দেখে যেতে পেরেছেন স্বয়ংসেবকরা সারাদেশে হাজার হাজার সেবাপ্রকল্প চালাচ্ছেন। উল্লেখযোগ্য যে, বালাঘাটের কারঞ্জায় তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি সেই ধনরাশি দিয়ে নাগপুর-ওয়ার্ধা রোডস্থিত খাপরিতে ২০ একর জমি কেনেন। ১৯৭০ সালে এই কৃষিজমি ভারতীয় উৎকর্ষ মণ্ডলকে দান করেন। এই জমিতে এখন গ্রামের বালক-বালিকাদের জন্য স্কুল, গোশালা এবং স্বামী বিবেকানন্দ মেডিক্যাল মিশন নামে একটি হাসপাতাল গ্রামের লোকেদের সেবার জন্য কাজ করে চলেছে।

প্রচণ্ড ডায়াবেটিক রোগ সত্ত্বেও তিনি ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেন। যখন আর পারছিলেন না, তখন কার্যকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর দায়িত্ব রজ্জু ভাইয়াকে সমর্পণ করার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন— তাঁর দাহসংস্কার একজন সাধারণ লোকের মতো এক সাধারণ শ্মশানেই যেন করা হয়। জীবিতকালে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে দু'টি কথা ছিল— এক, তাঁর নামে কোথাও যেন স্মারক নির্মাণ করা না হয়। দুই, সঙ্ঘের কার্যক্রমে আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাঃ হেডগেওয়ার এবং দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর চিত্র ছাড়া আর কোনো সরসঙ্ঘচালকের চিত্র যেন না রাখা হয়।

চেন্নাই বিমানবন্দরে অবতরণের পর তাঁর আগ্রহ ছিল তাঁকে যেন স্থানীয় কোনো কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখান থেকে তিনি বোমা বিস্ফোরণে নিহতদের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। চিকিৎসকরা দেখলেন তখন তাঁর রক্তচাপ ১৮০/১১০। রক্তচাপ কম হওয়ার জন্য তাঁকে ট্যাবলেট দেওয়া হচ্ছিল। তাঁরা চিন্তিত ছিলেন এ অবস্থায় কীভাবে তাঁকে কার্যালয়ে রাখা যায়, যেখানে কোনো ভালো ব্যবস্থাই নেই। বিকেলে তাঁর রক্তচাপ ২২০/১২০-তে উঠে যায়। ডাক্তারবাবুরা চিন্তিত, যে কোনো সময় কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

তাঁকে কার্যালয়েই আনা হয়েছিল। বিকেলে বিস্ফোরণে নিহত শহীদদের আত্মীয়-স্বজন মিলে ২০০ জন এসেছিলেন। বাইরে সামিয়ানার তলায় রাখা চিত্রে হুইল চেয়ারে বসেই ফুল, মালা ও ধূপ দিলেন। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে এক এক করে কথা বললেন। তাঁদের প্রিয় সরসঙ্ঘচালক এসেছেন সমবেদনা জানাতে, তাই তাঁদের চোখে জল। সরসঙ্ঘচালকের চোখেও জল। তখন সবার চোখের ভাষা যেন ছিল— 'আপনি সত্যিকারের মহাত্মা'। কার্যক্রম শেষে প্রার্থনার পর চিকিৎসকরা আবার তাঁর রক্তচাপ দেখলেন— ১২০/৯০। স্বাভাবিক। মনে হলো এবার তিনি একটু শান্তি অনুভব করলেন।

সমাজের জন্য সমর্পিত প্রাণ এই 'মহাত্মা' ১৯৯৬ সালের ১৭ জুন পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে নাগপুরের সাধারণ মানুষের জন্য শ্মশানঘাটে তাঁর দাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষদের জন্য যে সেবাশৃঙ্খলের যোজনা তৈরি করে দিয়ে গেছেন তা আজ সারা ভারতে বিশাল আকার ধারণ করেছে। সেই সেবাপুরুষের প্রেরণাই আজ ভারতে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত পঞ্জীকৃত সেবা প্রকল্পের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫২ হাজার। তবু যতক্ষণ দেশের শেষ সারির শেষ মানুষটির কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া না যাচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর আত্মা অতৃপ্তই থেকে যাবে। ▮

উপনিষদের কালজয়ী শিক্ষা সমরসতা

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সমরসতা শব্দটির সঙ্গে হয়তো অনেকেরই পরিচয় নেই। তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, সমরসতার অর্থ আত্মিক বন্ধন যা সকলকে একসূত্রে বাঁধতে পারে, পারস্পরিক বোঝাপড়া যা সকলের সঙ্গে সকলের সমন্বয় সাধন সম্ভব করে। ইংরেজি ভাষায় এই একাত্মতা বোধকেই বলা হয়েছে হারমনি।

আমরা এখন একটি অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি যেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, আর হানাহানি দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ নিরাপত্তার অভাববোধ করছে। এখানেই সমরসতার প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা, যার অভাবে চতুর্দিকে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এত সংঘর্ষ, এত অশুভ শক্তির মদমত্ততা, এত অশান্তি।

সমরসতা বস্তুত উপনিষদের এক কালজয়ী শিক্ষা। বেদের অন্তে রয়েছে উপনিষদ, তাই উপনিষদকে বলা হয় বেদান্ত। উপনিষদের প্রধান উপদেশগুলি শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার আঠারোটি অধ্যায়ে ধরা আছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ঈশোপনিষদকেই প্রথম হিসাবে ধরা হয়, এখানেই মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত দেবত্ব এবং সমস্ত সৃষ্টির একত্বের কথা বলা হয়। সকল সৃষ্টির মধ্যেই এক সদ্‌বস্তু বিদ্যমান, উপনিষদ সমস্ত কিছুর মধ্যেই সেই এককে প্রত্যক্ষ করে জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়। জীবনের সকল সদর্থক কাজকেই পূজা হিসাবে দেখতে শেখায়। এখানে নারীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে মা হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যদি পরিবার পরিজনের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করেন, তাহলে বাড়িতে একটি শান্তিময় পরিবেশ গড়ে উঠবে। ঘরের কাজে যারা সাহায্য করে অর্থাৎ পরিচারক, পরিচারিকা, গাড়ির চালক সকলের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা, তাদের মনে আঘাত না দেওয়া, তাদের নীচু নজরে না দেখা, এভাবেই সমরসতা পরিবারের বৃত্ত থেকেই জন্ম নেয় এবং ক্রমশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

"হে ভারত ভুলিও না...নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই" স্বামীজী ছিলেন মানবতাবাদী। তিনি বুঝেছিলেন যে কেবল বৈষয়িক উন্নতির মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে বেদান্তের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, যে বাণীর উদ্দেশ্য সমগ্র মানবজাতিকে প্রেম, প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধা, সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন করা। এই ঈশ্বরই পরমাত্মা যিনি আত্মারূপে সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান। এই আত্মার উপলব্ধিই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। উপনিষদ বলেছেন— 'অহং ব্রহ্মাস্মি'— আমিই ব্রহ্ম, 'তত্ত্বমসি'— তুমিই সে, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'— এই আত্মাই ব্রহ্ম, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'— সব কিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অস্তিত্ব। এই বোধটি মা যদি তাঁর সন্তানের মনের মধ্যে গেঁথে দিতে পারেন, তাহলে বড় হয়ে সে মানবিকতার মূল্য বুঝবে, প্রকৃতির মূল্য বুঝবে। পথে চলতে চলতে পথের ধারে শুয়ে থাকা কুকুরটিকে লাথি মারবে না। সে একজন প্রকৃত মানুষ হিসাবে তৈরি হয়ে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পরমাত্মা কেবলমাত্র মানবজগতেই সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, জল, মাটি, আকাশ-বাতাস সব কিছুতেই তিনি আছেন। এই জন্যই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা প্রকৃতিকে পূজা করতে শিখিয়েছে। জীবজগৎ, জড়জগৎ সবই প্রকৃতির অবদান, এই বিচিত্র প্রকৃতির মধ্যেই পরমাত্মার অবস্থান। পাশ্চাত্য জগৎ প্রকৃতি পূজারিদের পেগান বা জংলি আখ্যা দিয়ে এসেছে বরাবর; তাদের করেছে উপহাসের পাত্র। আজ কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষ ছুটে ছুটে আসছে ভারতে, আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পেতে, তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে আর্থিক প্রাচুর্য সুখ দিতে পারে কিন্তু মানসিক শান্তি দিতে পারে না। ভারতের আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য, উপনিষদের সমরসতার শিক্ষা তাদের ভারতীয় পরম্পরার প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

টাকাটা যদি তাঁরা কোনো অনাথাশ্রমে, কোনো বৃদ্ধাবাসে, অথবা বাড়ির কাজের লোকের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য দান করতেন, তাহলে ওই মানুষগুলির সঙ্গে তাদের কিন্তু একটি সমরসতা বা হারমনি তৈরি হয়ে যেত। এই ভাবেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে নিজেদেরকে একসূত্রে বাঁধতে পারি।

আজ আমাদের দেশ নানা সমস্যায় জর্জরিত, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল দেশের স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে বেশি আগ্রহী। তাই আজ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা প্রতিবেশী দেশ থেকে নানা ধরনের

অপকৌশলের সাহায্যে ভারতে ঢুকছে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ ভারতের চেয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বেশি একাত্মতা বোধ করে, নিছক ধর্মীয় কারণে। তাদের মনে রাখা দরকার যে তারা প্রথমে ভারতীয়, ভারতের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, তারপর তাঁরা কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বী। এদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ উপনিষদের সমরসতার শিক্ষায় বিশ্বাসী, সে কারণেই ভারতে আজ নানান ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সংবিধানেও রয়েছে সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকার। আজ দেশের অখণ্ডতা রক্ষার প্রশ্নটি খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য দেশ আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। এখানেই সমরসতার আদর্শের সব থেকে বেশি প্রয়োজন। এই আদর্শ মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে সমস্ত জীবজগতের, সমস্ত প্রকৃতির যে যোগসূত্র, সেই যোগসূত্রকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয়, একটি আত্মিক বন্ধনে সকলকে বেঁধে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করে। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে। পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে গ্রাম-শহরের সীমানা পেরিয়ে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমরসতা সকলের মনের মধ্যে একটি একতাবোধ জাগিয়ে তোলার শিক্ষা দেয়। দুঃখের দিনে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, দুঃখী মানুষটিকে বোঝানো যে 'তুমি একা নও, আমি একজন ভারতীয় হিসাবে তোমার পাশে আছি', একজন অবসাদগ্রস্ত মানুষকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য কিন্তু এই আশ্বাসটুকুই অনেক। অন্য ধর্মের মানুষটিকে বিধর্মী বা কাফের মনে করলে কিন্তু কোনোওদিনই দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করা যাবে না।

আমাদের চারপাশে যারা আছে, যাদের দেওয়া সেবার উপর আমরা নির্ভরশীল, যেমন ধোপা, নাপিত, ঝাড়ুদার, চাষি, ক্ষেতমজুর, পাড়ার মুদির দোকানের বিক্রেতাটি, এরাও মানুষ, আমরা যেন তাদের নীচু নজরে না দেখি, অর্থাৎ সমরসতা, প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা, ধর্মীয় কুসংস্কার বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব এবং অহংবোধ ছাড়তে হবে।

পরিবারে আজ যে ছোট্ট একটি মেয়ে ভবিষ্যতে সে কারও সহধর্মিনী, পরবর্তীতে সে সন্তানের মা। মা'র প্রভাব সন্তানের উপর খুব বেশি তাই মা'কে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। শুধু তার সন্তানের মধ্যেই নয়, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও এই সচেতনতাটা জাগাতে হবে যে জগৎ সংসারের সর্বত্রই ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে, ঈশ্বর কেবলমাত্র বাড়ির ঠাকুরঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন, এই উপলব্ধিটাই সমাজে সমরসতা আনতে সাহায্য করে।

স্বাধীনতার প্রায় সত্তর বছর পরেও আমাদের দেশে এখনও ৪০ কোটি মানুষ দৈনিক পঞ্চাশ টাকার বেশি আয় করতে পারে না, প্রতিবছর পঞ্চান্ন হাজার প্রসূতি অপুষ্টির কারণে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়, প্রতি বছর তেরো লক্ষ শিশু জন্মের দু' তিন মাসের মধ্যেই মারা যায়। স্বামীজী বলেছিলেন— ''ভারতের একটি মহাপাপ হচ্ছে গরিবদের পিষে মারা।'' শুধুমাত্র ২০১০ সালে দেশের পনেরো হাজার ন'শো চুয়ান্নজন চাষি দেনার দায়ে আত্মঘাতী হয়েছে। আমরা মহিলারা নিজেদের সাধ্যমত দুঃস্থ মানুষগুলির পাশে দাঁড়াতে পারি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে পারছি না। সম্প্রতি এই বাংলায় বিশেষ করে কলকাতায় 'ধনতেরস' বলে একটা হুজুগ চালু হয়েছে। সাত আট বছর আগেও এই শব্দটার সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ছিল না। আর এখন? শ্রীশ্রী কালীপূজার দু'দিন আগে প্রতিটি গয়নার দোকানে মহিলাদের লম্বা লাইন। তাদের পাশে তাদের পতি দেবতারা পকেটে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে দণ্ডায়মান, কখন দোকানের কাউন্টারের সামনে পৌঁছতে পারবে। এই টাকাটা যদি তাঁরা কোনো অনাথাশ্রমে, কোনো বৃদ্ধাবাসে, অথবা বাড়ির কাজের লোকের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য দান করতেন, তাহলে ওই মানুষগুলির সঙ্গে তাদের কিন্তু একটি সমরসতা বা হারমনি তৈরি হয়ে যেত। এই ভাবেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে নিজেদেরকে একসূত্রে বাঁধতে পারি।

আজ আর ইংরেজের সঙ্গে আমদের স্বাধীনতার সংগ্রাম নেই, কিন্তু দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আমাদের সবাইকে নির্বিশেষে সামিল হতে হবে। অনেক অশুভ শক্তি আজ মাথা চাড়া দিয়েছে, তাই আমাদের বুঝতে হবে এবং অবুঝকে বোঝাতে হবে যে সমাজে ভেদভাব থাকলে চলবে না, সবাইকে একটি আত্মিক বন্ধনে বাঁধতে হবে। সবাইকে মনে রাখতে হবে যে আমি ভারতমাতার সন্তান, মা একবার ত্রিখণ্ডিতা হয়েছেন, আর তার পবিত্র শরীরে আঘাত হানতে দেব না। তবেই পরিবারের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় থাকবে, অশুভ শক্তি পরাস্ত হবে, উপনিষদের বাণীর যথার্থতা আমরা অন্তরে উপলব্ধি করতে পারব, সমরসতার আদর্শের জয় হবে।

(লেখিকা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা)

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্তু এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

১৬১/১ এম জি রোড, রুম নং ৫১
বাঙ্গুর বিল্ডিং, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭
ফোন : ২২৬৮০৯৬২, ২২৭৩৫৭৯২
E-mail : kalyanashram.kol@gmail.com

চিঠিপত্র

দানবীর মুখ্যমন্ত্রী

আমরা অনেক দানবীরের কথা পড়েছি। কেউ কেউ বা শুনেছি। কিন্তু বর্তমান দানবীর পূর্বের সকলকে পিছনে ফেলে দৌড়ের লাস্ট ল্যাপে ও ফিনিশিং-এর দড়ি স্পর্শ করে বিজয় স্তম্ভের সর্বোচ্চ আসনে দণ্ডায়মান হয়ে প্রমাণ করলেন যে, পিছনে যদি গৌরী সেন থাকে তাহলে দাতা 'সাজতে' কোনো ভয় হয় না। সাজতে এই কারণে বললাম এই দানের পিছনে আছে শুধু আগামী নির্বাচনে জেতার হীন প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। এজন্যই এইরূপ নাটুকেপনার প্রদর্শন।

প্রথমে আসি সংখ্যালঘুর জন্য সাইকেল বিতরণ। পরে নিজের বুদ্ধির ঘাটতির প্রমাণ পাওয়াতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের দিকে হেলে সকলকেই সাইকেল প্রদান। উনি যেভাবে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য ভেবে আকুল তারা কিন্তু ওনার জন্য এতটুকুও ভাবেন না আর ভাববেনও না। কারণ ফরোয়ার্ড ব্লকের এক বিধায়ক কলিমুদ্দিন সামস একবার বলেছিলেন ''আমি প্রথমে মুসলমান পরে ভারতীয়। কথাটা যে কতবড় সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা সেটুকু বলার অপেক্ষা রাখে না। আরও আছে, ভারতীয় 'ক্রিকেটে বেটিং-য়ে ধরা পড়ার পর ৯৯টি টেস্ট খেলার ভারতীয় অধিনায়কের সাজা হওয়ার পর, যাতে ১০০তম টেস্ট খেলতে পারেন তার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের ধরেও বিফল হওয়াতে উনিও বলেছিলেন, ''আমি মুসলমান বলে সুবিধা পাচ্ছি না।'' তাহলে চিন্তা করুন এরা নিজেদের সাচ্চা ভারতীয় আগে কোনোদিন ভাবেনি। বর্তমানেও (পশ্চিমবঙ্গের শাসকশ্রেণীর এত তোল্লা পেয়েও) ভাবছেন না আর ভবিষ্যতেও যে ভাববে না তা অতীত ও বর্তমানই জ্বলন্ত উদাহরণ।

হ্যাঁ এবার আসি পশ্চিমবঙ্গে যত ক্লাব আছে প্রাথমিকভাবে যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে গৌরী সেনের তহবিল থেকে ক্লাবপিছু দুই লক্ষ করে টাকা এককালীন দান প্রসঙ্গে।

এই দু' লক্ষ টাকা করে প্রায় প্রতিটি রেজিস্টার্ড ক্লাবকে দেওয়া হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর থেকে। যে ক্লাগুলিকে আপাতত দেওয়া হয়েছে ভালো করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে ওইসব ক্লাগুলির সঙ্গে কোনোপ্রকার বহির্বিভাগীয় খেলাধুলার যোগ নেই; শুধু তাস, পাশা, ক্যারাম এইসব খেলা হয়। রাতারাতি আর্থিক আয় ও ব্যয়ের খাতা তৈরি করে অডিট করিয়ে লোকাল এম এল এ-র নিকট পেশ ও পাশ করিয়ে নিয়ে জমা, আর কোনোপ্রকার তদন্ত না করিয়েই অনুদান প্রদান। যাতে তাদের নিয়োগ করে সেই অঞ্চলের বেশিরভাগ ভোটারকে কষ্ট করে ভোটকেন্দ্রে লাইন দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করা।

পরিশেষে একটা কৌতূহল জাগছে বাংলার জনগণের মনে, গদি বদলের সময় সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়েছিল সিপিএম নাকি দু' লক্ষ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা ঋণ রেখে গেছে। তাহলে এইভাবে দান করার অর্থ আসছে কোত্থেকে?

—দেবু সরকার,
বর্ধমান।

মাংস খাওয়া না খাওয়া

কচ্ছপের মাংস নিষিদ্ধ করে যখন আইন জারি হলো তখন 'মাংস খাওয়া যে ব্যক্তি স্বাধীনতা' একথা বলে চেঁচামেচি কখনও শোনা যায়নি। কারণ কচ্ছপের মাংস হিন্দুরা খায়।

আজ গোমাংস নিয়ে চলছে তুমুল হট্টগোল। লক্ষ্য মোদী সরকার। যে কারণে কচ্ছপের মাংস নিষিদ্ধ হয়েছে সেই একই কারণে সংবিধানের নির্দেশ সত্ত্বেও গোমাংস নিষিদ্ধ হয় না। কারণ 'ভারতের বেশিরভাগ ধর্মনিরপেক্ষ লোকই মুসলমানপন্থী এবং হিন্দু বিরোধী'— তসলিমা উবাচ।

—কৃষ্ণকান্ত সরকার,
দমদম।

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা

স্বস্তিকা ২০১৫-র পূজা সংখ্যায় 'জমি অধিগ্রহণ স্বদেশ ও বিদেশ' প্রবন্ধটি পাঠ করে অত্যন্ত ভালো লাগলো। অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ বিদেশে প্রয়োগ করে কীভাবে তারা এগিয়ে গেছে আর আমাদের দেশে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ বিলটি রাজনীতির কূটকচালিতে পিছিয়ে আছে তা পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য মহাশয়।

আমি নিজে একজন সাধারণ কৃষকঘরের সন্তান। উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে কৃষিজমিগুলি পতিত জমিতে পরিণত হয়েছে। সমস্ত কৃষকের মুখে আলোচনা হচ্ছে, কৃষিকাজে আয় নেই। কৃষি কাজের বীজ থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজার থেকে উৎপাদিত জিনিসের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এই প্রজন্মের যুবকদের কৃষিকাজের প্রতি অনিহা বেড়ে গেছে। গ্রামের বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। কেননা কোনো শিল্প নতুন করে গড়ে উঠছে না। এটা গ্রাম-বাংলার চিত্র।

এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় উপযুক্ত কৃষি শিল্পনীতি। তবেই আটকানো যাবে গ্রামের যুবকদের। ফিরে আসবে উপযুক্ত পরিবেশ। তাই লেখক নৃপেন্দ্রবাবুর ভাবনা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হচ্ছে।

—জয়রাম মণ্ডল,
কলকাতা।

ইউরোপে মুসলমান শরণার্থী

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র একটা লেখায় মুসলমানদেরকে কাক এবং সারমেয়র সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, মুসলমানরা এই দুই শ্রেণীর প্রাণীর মতোই কলহপ্রিয়।

সম্প্রতি মুসলমান দুনিয়ার হালহকিকত সম্বন্ধে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁদের অবগতির জন্য জানাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুসারে ২০১১ সাল থেকে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া ইস্তক ৬০ লক্ষাধিক মানুষ দেশ ছেড়েছেন। গত ৪ বছরে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২.৫ লক্ষ মানুষ। আর চলতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪.৫ লক্ষ। এর মধ্যে হাজার তিনেকের প্রাণ গিয়েছে ভূমধ্যসাগরের জলে ডুবে। এখনও সাগর পেরিয়ে ইউরোপে ঢুকতে অপেক্ষারত প্রায় ৮.৫ লক্ষ। রাষ্ট্রসঙ্ঘ আরও বলেছে, শরণার্থী তালিকায় ৫০ শতাংশই সিরিয়ার নাগরিক। যেখানে কট্টরপন্থী একটি ইসলামি সংস্থার অত্যাচারে এই বিরাট সংখ্যক লোক দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তারা যুবতীদের ধরে নিয়ে গিয়ে যৌনদাসী হিসাবে ব্যবহার করছে এবং বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। স্কুল কলেজ ধ্বংস করে দিচ্ছে। খৃষ্টপূর্ব বহু পুরাকীর্তি বিস্ফোরকের সাহায্য গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। যারা তাদের এইসব অপকর্মের বিরোধিতা করছে তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করছে। এই পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিজের দেশ ছেড়ে ইউরোপীয় দেশগুলির দিকে ধাবিত হচ্ছে। জার্মান একটি ক্ষুদ্র দেশ ইতিমধ্যেই ৮ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এছাড়াও প্রতি বছর আরও ৫ লক্ষ করে শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। অথচ একটা আশ্চার্য ব্যাপার পৃথিবীতে ৫৬টি মুসলমান রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত। ওইসব মুসলমান দেশ একটাও শরণার্থীকে তাদের দেশে আশ্রয় দিচ্ছে না। যে সৌদি আরব থেকে সমগ্র দুনিয়ায় ইসলাম রপ্তানি হয়, হজ উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আগমনের ফলে বিশাল সংখ্যার অর্থ উপার্জন হয় তারাও এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। পক্ষান্তরে, সৌদি রাজপুত্ররা তাদের নিজস্ব বিমানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ দামের গাড়ি বহন করে নিয়ে গিয়ে লন্ডনে ঈদের বাজার করতে ব্যস্ত। ওইসব গাড়িগুলি কোনোটা সোনার পাত দিয়ে মোড়া, আবার কোনোটা সোনার জলে রং করা। ওইসব গাড়ি যখন লন্ডনের রাস্তায় দাঁড়ায় তখন সে দেশের চিত্রতারকা এবং ধনীর দুলালরা ওইসব গাড়িতে হাত বুলিয়ে তৃপ্ত হন। এইসব দেখেশুনে আমার মনে একটা চিন্তার উদ্রেক হয়েছে যা নিম্নরূপ : ইটালিয়ান দার্শনিক মেকিয়াভেলির একটা থিওরি হলো— ''বর্তমান যুগে যুদ্ধ করে অন্য দেশ দখল করে রাখা সম্ভব নয়, তাই কোনো দেশ দখল করতে হলে যত বেশি সংখ্যক পারা যায় সে দেশে নিজেদের লোক চালান করে দেওয়া'' এই কথা যদি সত্য হয় তবে মুসলমানরা সমগ্র ইউরোপকে ইসলামের সুশীতল ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুসলমানরা পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাস করে না। যে সব মহিলারা ওইসব ইউরোপীয় দেশে যাবেন তাদের গর্ভজাত সন্তানরা জন্মসূত্রে সে দেশের নাগরিক হয়ে যাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ওই দেশ একটি মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের মানবিকতা এবং অনুকম্পা দেখাতে গিয়ে অরাকান নামক একটি বৌদ্ধ রাজ্য কীভাবে মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি।

বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আরাকান মায়ানমারের অন্তর্গত একটি রাজ্য। এই রাজ্যের রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এখানে তারাই প্রথম বৌদ্ধমূর্তি এবং প্যাগোডা স্থাপন করেন। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস বাজেয়াং সূত্রে জানা যায় রাজা মহৎইঙ্গ চন্দ্রের (৭৮৮-৮১০) রাজত্বের শেষ দিকে আরাকান নিকটবর্তী রামরী দ্বীপের নিকটে আরব জলদস্যুদের একটি বাণিজ্য জাহাজ ডুবে যায়। তাতে অধিকাংশ জলদস্যু জলে ডুবে মারা যায়। যে কয়জন জীবিত ছিল তারা আরাকানে এসে উপস্থিত হয়। রাজার সৈন্যসামন্তরা তাদের বন্দী করে রাজদরবারে উপস্থিত করলে রাজা তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে স্বীয় রাজ্যে বসবাসের অনুমতি দেন, রাজার অনুমতি প্রাপ্ত এই আরব জলদস্যুরাই আরাকানে বসতি স্থাপনকারী প্রথম মুসললমান জনগোষ্ঠী, পববর্তীকালে তারা স্থানীয় রমণীদের বিবাহ করে আকারানে ইসলাম চাষাবাদ আরম্ভ করে। এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরাকানে অভাবনীয় ভাবে মুসলমান অনুপ্রবেশ পরিলক্ষিত হয়। ধীরে ধীরে আরাকানে মুসলমান অত্যাচারীদের দ্বারা নারী অপহরণ, ধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের চাপে আরাকান রাজারা নিজেদের বৌদ্ধনামের পাশাপাশি মুসলমান নামও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে আরাকানের লিঙ্গায়েত বংশের শেষ রাজা মিনসুরাম ওরফে পর মিখলা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সুলেমান শাহ নাম গ্রহণ করে লেপ্র নদীর তীরে রাজধানী স্থাপন করে একটি বৃহদাকার মসজিদ নির্মাণ করেন যা সান্দিকা মসজিদ নামে বিখ্যাত। এসব দেখেও ইউরোপিয় ইউনিয়নের দেশগুলি শিক্ষাগ্রহণ না করে তবে অদূর ভবিষ্যতে তারাও মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং শরিয়তি সংবিধান মানতে বাধ্য হবে। সমগ্র ইউরোপ-এর ছোট ছোট দেশগুলিতেও মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে সেখানকার আদি বাসিন্দারা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। যে ৫৬টি মুসলমান দেশ আছে তারা একটাও মুসলমানকে স্থান দিচ্ছে না— এটা একটা ষড়যন্ত্র। এমন ঘটনার শিকার আমরা হয়েছি। আর তা যাতে না ঘটে, তার জন্য জনমত গঠন করা দরকার। ■

স্বামী বিবেকানন্দ ও সামাজিক সমতা

অভিমন্যু গুহ

আক্ষরিক অর্থেই শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দকে অসম লড়াই লড়তে হয়েছিল। একে তো কপর্দকশূন্য অবস্থায় অচেনা অজানা বিদেশ-বিভুঁইয়ে অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবককে প্রথমে পায়ের তলায় মাটির খোঁজে অস্তিত্বের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আপন প্রতিভায় যেটুকু পায়ের তলায় মাটি জুটলো সেটুকু কেড়ে নিতেও খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের চেষ্টায় কোনো খামতি রাখেনি। আর এ কাজে তাদের মুখ্য হাতিয়ার ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে অকল্পনীয়, অবাস্তব ও অসম্ভব সব গাল-গল্প তৈরি করে তা নিয়ে অপপ্রচার। যেমন ভারতবর্ষের মানুষ বাঘ ও সাপের সঙ্গে সহাবস্থান করে, শিশু জন্মালে মা তাকে সাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ইত্যাদি। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো যুক্ত হয়েছিল স্বামীজীর পোশাক-আশাক। আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ ইতিপূর্বে এ ধরনের গেরুয়াধারী কোনো ভারতীয় সন্ন্যাসীকে দেখেননি। বরং বিবেকানন্দের পোশাক- পরিচ্ছদ তাঁদের কাছে কিম্ভূতকিমাকার লাগলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ তো রবাহূত বৈ অন্য কিছু ছিলেন না। ভারতবর্ষ থেকে অন্য যে সব প্রতিনিধিরা আমেরিকায় ধর্মমহাসভায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সমসময়ে ছিলেন সুপরিচিত। অথচ ভারতবর্ষের যে মানুষদের জন্য পাশ্চাত্যে গলা ফাটালেন বিবেকানন্দ, সেই সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রাথমিক স্বীকৃতিটুকুও তাঁর ছিল না। আসলে ধর্মমহাসভায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রতিনিধিরা অনেকাংশে বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই গণ্য হয়েছিলেন। সেদিক দিয়েও বিবেকানন্দ ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি ভারতবর্ষ এবং হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধি হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। স্বদেশ ও স্বীয় সমাজের গুণের সঙ্গে দোষও মেনে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। পরাধীন ভারতবর্ষ আর আটশো বছরের পরাধীনতায় কূপমণ্ডুক

হিন্দু সমাজের মুখ্য যে ত্রুটি শিকাগো ও তারপরেও সর্বত্র সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে উৎপীড়িত করেছিল, সেটি হলো অবশ্যই জাতিভেদ প্রথা। এবং এর শিকার তিনি নিজেও হয়েছিলেন। শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার, হিন্দুর কালাপানি পার— ইত্যাদি নির্বোধের উক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে।

তবুও স্বদেশ, স্বধর্মকে বর্জন করে তিনি শুধু নিজেকেই বিখ্যাত করতে চাননি। সেই ইচ্ছা করলে তাঁর বিখ্যাত হওয়ার পথ হয়তো সহজতর হোত, তবে তিনি কালজয়ী হতে পারতেন না। শিকাগো ধর্মমহাসভায় ভারতের অন্যান্য প্রতিনিধিদের কি আমরা সেভাবে স্মরণে রেখেছি? তাই ১৮৯৭ সালের গোড়ায় ভারতের মাটিতে পা রেখেই বিবেকানন্দ স্বামী প্রথম যে সমস্যাটি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন সেটি অবশ্যই জাতিভেদ প্রথা। বিবেকানন্দ 'শূদ্র জাগরণে'র কথা বলেছিলেন এবং সেই অর্থে তাঁকে জাতিভেদ প্রথার জঘন্য শিকার মানুষগুলির আলোকবর্তিকা বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার এর জন্য ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি কোনো জিগির তোলেননি। তিনি সবসময়ই মনে করেছেন ভারতবর্ষের মানুষের কাজের ওপর ভিত্তি করে জাতি-প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তীকালে জাতিবিভাগের নামে তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের ওপর যে অত্যাচার নেমে এসেছে তার দায় ভারতের সমাজের নয়। আমেরিকা থেকে ফিরে মাদ্রাজে 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের উপকারিতা' শীর্ষক এক বক্তব্যে বিবেকানন্দ সওয়াল করলেন জাতি বিভাগের পক্ষে। কিন্তু একইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন ভারতবর্ষের জাতি বিভাগ মানুষকে অপমান করতে, ঘৃণা করতে শেখায় না। বরং প্রত্যেক মানুষই যে সমান, প্রত্যেকের মধ্যেই যে অনন্ত ঈশ্বর বিরাজমান— এই সত্যকেই তুলে ধরে জাতিবিভাগ। তিনি বললেন— ''জাতিবিভাগ অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। সমাজের প্রকৃতিই এই— বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া। তবে চলিয়া যাইবে কি? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর

থাকিবে না। জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোনো বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পারো। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পারো, আমি একজোড়া জুতা সারাইতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না। তুমি কি আমার জুতা সারাইয়া দিতে পারো? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কার্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তাই বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না। তুমি খুন করিলে প্রশংসা পাইবে, আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমাকে ফাঁসিতে যাইতে হইবে--- এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার-তারতম্য উড়িয়া যাইবে। জাতিবিভাগ ভালো জিনিস। জীবনসমস্যা-সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। লোকে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করিবে; ইহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে হইবে। যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে— তুমি যেমন আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী, কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সেই ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই আমরা চাই— কাহারও কোনো বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা থাকিবে।'' ('স্বামীজীর বাণী ও রচনা', উদ্বোধন, শতবার্ষিকী সং, ১৯৬৪, প. ১০৬)।

সনাতন ভারতবর্ষে কর্মের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের বিরাট সমর্থক ছিলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু পরাধীনতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে সেই শ্রেণীবিন্যাস যখন শ্রেণীবৈষম্যের জন্ম দিল, মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলো, মানুষকে ঘৃণা করতে শেখালো; আরও স্পষ্ট করে বললে জাতির নামে বজ্জাতি শুরু হলো— স্বামীজী এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হলেন। ১৮৯৩ সালের ২০ আগস্ট শিকাগো ধর্মমহাসভার অব্যবহিত আগে ম্যাসাচুসেটস-এর মেটকাফ থেকে তাঁর দক্ষিণী ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলকে এক পত্রে বিবেকানন্দ লিখলেন— ''হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোনো ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোনো ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোনো দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পরমার্থিক ও ব্যবহারিক' নামক মত দ্বারা সর্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।'' (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সং-১৯৬১, পৃ. ২৮৬-২৮৭)

উপরে উদ্ধৃত 'পরমার্থিক ও ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন— ''যখন লোককে বলা যায়, 'তোমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া এবং কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ, লোকে তখন এইভাব কার্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই উত্তর দেয়, 'পরমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক।' এই ভেদদৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষ-হিংসা রহিয়াছে।'' (সূত্র : ওই, পৃ. ২৮৭)। আসলে আমেরিকায় পা রাখার পর থেকেই বিবেকানন্দ উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে, তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের ধ্বজা ওড়াবার চেষ্টা করলে খৃষ্টান মিশনারিদের লক্ষ্য হয়ে যাবেন এবং তৎকালীন সময়ে কূপমণ্ডুক হিন্দু-সমাজের ছিদ্রগুলি তুলে ধরে মিশনারিরা তাঁকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করবেই। আর এই কঠিন লড়াই তাঁকে একাই লড়তে হবে। কারণ ধর্মমহাসভায় যোগদানকারী অন্য ভারতীয়রা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব দেখাতে পারলেই যেন বাঁচেন!

তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে হিন্দুধর্মের ছিদ্রান্বেষণে মিশনারিদের বড়ো হাতিয়ার ছিল জাতিবিভাগ প্রথা। তাই পাশ্চাত্যে এ নিয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছরের লড়াইয়ের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করে বিবেকানন্দ বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে অভ্যর্থনার যে সমস্ত প্রত্যুত্তর দিচ্ছিলেন বা বক্তৃতা করছিলেন, তাতে তাঁর ভাষণে সামাজিক সমতার বিষয়টি বারংবার উঠে আসছিল। বিবেকানন্দের এইসব বক্তৃতা বাংলা ভাষায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' ও ইংরেজি ভাষায় 'Lectrures from Colombo to Almora' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক এগুলি পড়ে ফেলতে পারেন।

বিবেকানন্দকে আমেরিকায় একজন 'নিগ্রো' বলে সম্বোধন করেছিলেন। বিবেকানন্দ তার প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ জগতে শ্রেণীবৈষম্যে, অত্যাচার, অনাচারের শিকার মানুষের সঙ্গে কেউ তাঁকে একাসনে বসালে তিনি খুশিই হতেন। 'বর্তমান ভারত' রচনায় তিনি দেশবাসীকে স্বদেশমন্ত্র শুনিয়েছিলেন— 'ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!' শূদ্র-জাগরণে আশা প্রকাশ করেছিলেন— 'তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম-কর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।' ('স্বামীজীর বাণী ও রচনা', ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯৬১, পৃ. ১৮৮)।

স্বামীজী কায়স্থকুলোদ্ভব হওয়ায় সে নিয়ে তাঁর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ ছিল তা বিবেকানন্দের 'আমার সমরনীতি' (মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত) বক্তৃতায় স্পষ্ট। ওই বক্তৃতাতেই তিনি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের মাথার চুল দিয়ে মেথরের শৌচালয় পরিষ্কারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছিলেন— 'যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত। কারণ আমি যাঁহার শিষ্য, তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৬৪; পৃ. ৭৬)। কুম্ভকোণম্-এর বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন— 'ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ব্রাহ্মণের আদর্শ চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।' (সূত্র : ওই, পৃ. ৬৬)। ব্রাহ্মণের প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বে স্বামীজীর শ্রদ্ধা বরাবরই অটুট ছিল। কিন্তু কায়েমি স্বার্থে তা যখন শোষণের হাতিয়ার হলো বিবেকানন্দ তার প্রতি বিরূপ হলেন। তখন শূদ্রের অন্তঃস্থিত ব্রাহ্মণত্ব জাগরণকেই তিনি পাখির চোখ করলেন। এবং আজকের সামাজিক সমতা রক্ষায় প্রেক্ষিতের বিপরীতধর্মী বদল সত্ত্বেও বিবেকানন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকর্য। ■

বৈদিক সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের কথা

রবীন সেনগুপ্ত

বিগত শতাব্দীতে মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, মাও প্রমুখ কর্তৃক যে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ প্রচলিত ও প্রযুক্ত হয়েছে তাতে ইতিমধ্যেই বহু ভ্রান্তি ধরা পড়েছে। বহু দেশে আধুনিক সাম্যবাদীদের নির্মমভাবে পতনও ঘটেছে। আধুনিক সমাজতন্ত্রীদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে আমরা যখন ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ধর্মাবলম্বী দৈবভাবাপন্ন শাসকদের কাজ নিয়ে

পর্যালোচনা করি, তখন দেখতে পাই যে নামে রাজতন্ত্র হলেও বৈদিক যুগের শাসন ব্যবস্থাতেও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সার্থক প্রয়োগ ছিল।

অনেকে বলবেন তা কী করে হয়? রাশিয়া ও চীনের সমাজতন্ত্রে তো জাতপাত বিভেদ নেই। সবাই সমান সেখানে। শোষণ নেই, ব্যক্তিমালিকানা নেই সেখানে। ধর্মকে আফিম বলা হয়েছে তাতে। আর ভারতবর্ষে বৈদিক শাসনব্যবস্থায় জাতপাত ছিল, ধর্মও ছিল প্রবল ভাবে। দুটো এক হয় কী করে?

এর উত্তরে বলা যায় যে বৈদিক সাম্য ব্যবস্থায় যেমন কর্ম ও গুণ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— এই চারটি বিভাগ ছিল বা এখনো আছে, ঠিক তেমনই মার্কসীয় ব্যবস্থাতেও বড় কমরেড, ছোট কমরেড, সাম্যবাদ বিরোধী ও সাধারণ মানুষ— এই চার শ্রেণী ছিল বা আছে। কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও অফিসে অন্য সব দেশের মতই এ, বি, সি এবং ডি এই চারটি গ্রুপের কর্মচারী ছিল বা আছে। মালিকের জায়গায় সেখানে শোষণ করত বড় কমরেডরা।

বৈদিক সাম্যব্যবস্থায় রাজা প্রশাসনিক প্রধান হলেও দেশের একদল সেরা জ্ঞানীগুণী রাজার পরামর্শদাতা ছিলেন। রাজবংশের লোকেরা তাঁদের গুরুর মতই সম্মান করতেন। বৈদিক ব্যবস্থায় প্রধান প্রশাসক থেকে সাধারণ মানুষ সবারই গুরু থাকত, সবাই একজনকে পুরোহিত নির্বাচন করে কাউকে না কাউকে পূজা করতেন। বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় গুরু, ইষ্টদেব, শাস্ত্রগ্রন্থ, পুরোহিত, পূজা— এইসব নেই। কিন্তু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তাদের ব্যবস্থাতেও এসবই আছে অন্যরূপে অন্যভাবে। মার্কস ও লেনিনের জন্ম দিনে কমিউনিস্ট প্রশাসক থেকে শুরু করে সাধারণ কমরেডরা সকলেই একটা সভায় আয়োজন করে। সভাতে কোনো এক কমিউনিস্ট নেতাকে সভার পৌরোহিত্য পদে নিযুক্ত করে ফুলমালা পূর্বক মার্কসপূজা, লেনিনপূজা করে। পূজাতে কমরেডদের কাঁসর ঘণ্টার ব্যবহার না থাকলেও কাস্তে-হাতুড়ি-তারা, কোদাল-বেলচা ইত্যাদি চিহ্ন ও স্লোগান থাকে। আমাদের গীতা, বেদ, পুরাণের মতো তাদেরও শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে দাস ক্যাপিটাল, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ইত্যাদি রয়েছে। আধুনিক সাম্যবাদী ব্যবস্থায় যে যৌথ খামার, সমবায়িকা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল সেরকম ব্যবস্থার কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়। একই জমি ও পুকুরের যৌথ শরিকি ব্যবস্থা প্রাচীন যুগে ছিল। বর্তমান কমিউনিস্ট শাসকরা যে গণশিক্ষার কথা বলে সেটাও বৈদিক যুগে ছিল না তা নয়। বৈদিক যুগে সন্ধ্যাবেলায় প্রতি গ্রামে পুরাণ পাঠের আসর বসত। আর পুরাণ মানেই নানা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের সমাহার। তাই পুরাণ শুনতে চারবর্ণের মানুষই জমায়েত হোত। আজও ভারতের নানা স্থানে এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রাচীন যুগের রাজা ও জমিদারদের খনন করানো অনেক জলাশয় আছে যেটি সকলে ব্যবহার করতে পারত। রাজাদের বিশেষ কক্ষে নৃত্যগীতের আয়োজন হোত। তাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত থাকতেন। জনগণের ব্যবহারের জন্য ছোটবড় রাস্তাও নির্মাণ করে দিতেন সে যুগের প্রশাসকরা। সে রাস্তার ধারে সরাইখানা ও বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থাও করতেন তাঁরা বেদেরই নির্দেশ।

বৈদিক সাম্যবাদ হলো আনুপাতিক সাম্যবাদ। অর্থাৎ নর-নারীর বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, দেহের গঠন, বয়স, বংশমর্যাদা ইত্যাদি দেখে তাদের প্রাপ্য বিষয়বস্তুগুলি দেওয়া হোত। মানুষের রক্তে চারটি গ্রুপ আছে। মাটি প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত হয় (বেলে, এঁটেল, লালমাটি ও দোআঁশ), খাদ্য চার প্রকারের হয় (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়), হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠে চারটি ভাগ থাকে, গাছ চার ভাগে বিভক্ত (বৃক্ষ, গুল্ম, বীরুৎ ও শৈবাল-ছত্রাক)। প্রকৃতির সমস্ত বিষয়েই চার পাঁচটি ভাগ আছে। উপবিভাগ আছে আরো বেশি। মানুষ প্রকৃতির বাইরে নয়। তাই মানুষকেও চতুর্বর্ণে বিভক্ত করে কিছু ভুল করেনি বৈদিককালের প্রশাসক ও ঋষিরা। বৈদিক সাম্যবাদ তাই সমাজবিজ্ঞানসম্মত।

চড়ুইভাতি চড়ুইভাতি

উন্নীতা মণ্ডল (নবম শ্রেণী)

প্রতি বছরই এই সময় সোয়েটার চাদর গায়ে দেওয়ার মতো শীত থাকে। কিন্তু এবছর শীত আসতে একটু দেরি করেছে। তবে তাই বলে যে মানুষ চড়ুইভাতির আনন্দ নিচ্ছে না তা নয়। গত ১৫ ডিসেম্বর আমরা এরকমই একটি চড়ুইভাতিতে অংশ নিয়েছিলাম। বৈদ্যবাটী শ্যামাচরণ নার্সারিতে। শেওড়াফুলি থেকে বেরিয়ে সকাল দশটার মধ্যে বৈদ্যবাটী পৌঁছে গিয়েছিলাম। মা-বাবা ও দিদাও সঙ্গে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে আমরা প্রায় তিনশো জন গিয়েছিলাম। খুব মজা হয়েছিল, হই হই করে কেটেছিল সারাদিন।

ওখানে যাওয়ার পরই আমাদেরকে লুচি, আলুর দম আর লাড্ডু দেওয়া হয়েছিল প্রাতঃরাশের জন্য। প্রাতঃরাশের পর শুরু হলো খেলধুলো। ছেলেমেয়েদের আলাদা আলাদা দল, আলাদা আলাদা খেলা। প্রথমে নিজের দলের মধ্যে পরিচয়পর্ব, তারপর খেলা। মিউজিক্যাল বল দিয়ে খেলা শুরু, এই খেলাতে আমি তৃতীয় হয়েছি।

আমাদের পরবর্তী খেলা মিউজিক্যাল চেয়ার। এই খেলায় আমি কোনো স্থান না পেলেও খুব মজা পেয়েছি। এরপর চোর-পুলিশ খেলায় আমি চোর ও এক দিদি চোর হয়েছিল। স্কুলে এই খেলা আমরা প্রায়ই খেলি। কিন্তু এই প্রথম ২২-২৩ জন মিলে এই খেলায় অংশ নিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ পাই। এইভাবে একের পর এক দারুণ মজাদার খেলায় যুক্ত থেকে বুঝতেই পারিনি কীভাবে এক-দেড় ঘণ্টা কেটে গেল।

এরপর আমরা বন্ধুরা মিলে নার্সারিটা ঘুরে দেখি। প্রথমেই এক অপূর্ব সুন্দর গোলাপের বাগান চোখে পড়ে। এর সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। সারা বাগান লাল, গোলাপি, হলুদ, সাদা ও নানা রঙের গোলাপ ফুলে পূর্ণ। মনে হচ্ছে বাগান থেকে যেন সৌন্দর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। অন্য এক বাগানে গাঁদা, ডালিয়া, দোপাটি, গোলাপ, জিনিয়া ও নানা রঙবেরঙের ফুলে ভরে রয়েছে গাছগুলি। বাগানের এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হই। মনে হয় বাগানে যেন রঙের খেলা চলছে। মৃদু বাতাসে ফুলগুলি যখন আন্দোলিত হচ্ছিল তখন দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন—'হেসে হয় কুটি কুটি'। তাছাড়া যেদিকে তাকাই সেদিকেই চোখে পড়ে নানা রকমের গাছ। বিশাল সবুজের সমারোহ দেখে আমাদের চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। এই শহরের মাঝেই প্রকৃতি যে এই বিশাল সবুজের সম্ভার নিয়ে অবস্থান করছে তা এখানে না এলে বুঝতেই পারতাম না। এরপর আমরা নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে যাই।

সেখানে এক ক্যুইজ কনটেস্টের আয়োজন করা হয়েছিল। অমানিশ কাকুর সঞ্চালনায় প্রশ্ন-উত্তর খেলা জমে ওঠে। এতে অংশ নিয়ে ভারত ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য জানতে পারি। খেলার শেষে মা সারদা, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিভাগের মধ্যে আমাদের বিভাগ ঝাঁসির রানী দ্বিতীয় হয়। প্রথম হয় নেতাজী সুভাষ।

এই খেলা শেষ হলেই আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন শুরু হয়। ভোজনের শুরুতে এক দাদা ভোজনমন্ত্র উচ্চারণ করে। আমরা গলা মেলাই। তারপর খেতে শুরু করি। পোলাও, ফুলকপি রোস্ট, চিলি পনির, চাটনি পাপড়, পায়েস, রসগোল্লা সহযোগে ভোজন সম্পন্ন হয়। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়ার মজাটাই আলাদা!

খাওয়ার পর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা সব মিলে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুন্দর হয়ে ওঠে।

এরপরই আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। প্রত্যেককে শুভ বিদায় জানিয়ে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশে। নানা রকমের খেলা, আনন্দ, হাসি, মজায় দিনটি যে কীভাবে গেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। অনেকে মিলে এক সঙ্গে এই দিনটি কাটিয়ে আমি ভীষণ আনন্দ পেয়েছি। ■

মনীষী কথা

বাবাসাহেব আম্বেদকর

ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার হলেন বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সংবিধান তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ড. আম্বেদকর।

আম্বেদকরের জন্ম ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল, মধ্যপ্রদেশের মউ-য়ে। মাহার সম্প্রদায়ের হওয়ার জন্য সমাজে তাঁদের পরিবারকে অস্পৃশ্য বলে মনে করা হোত। এই কারণে ছোটবেলা থেকে তাঁকে বহু অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। বিদেশ থেকে আরো অনেক ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ভারতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রশ্নবাণ

১.'মিসাইল ম্যান' কাকে বলা হয়?

২.'চৌরঙ্গী' কার লেখা?

৩.'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র স্রষ্টা কে?

৪.'বর্তমান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে?

৫.সবচেয়ে বড় বিষ্ণুমন্দিরটি কোথায়?

উত্তর : ১. এপিজে আবদুল কালাম। ২. শংকর। ৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ। ৪. বরুণ সেনগুপ্ত। ৫. কম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাটে।

ছবিতে অমিল খোঁজ

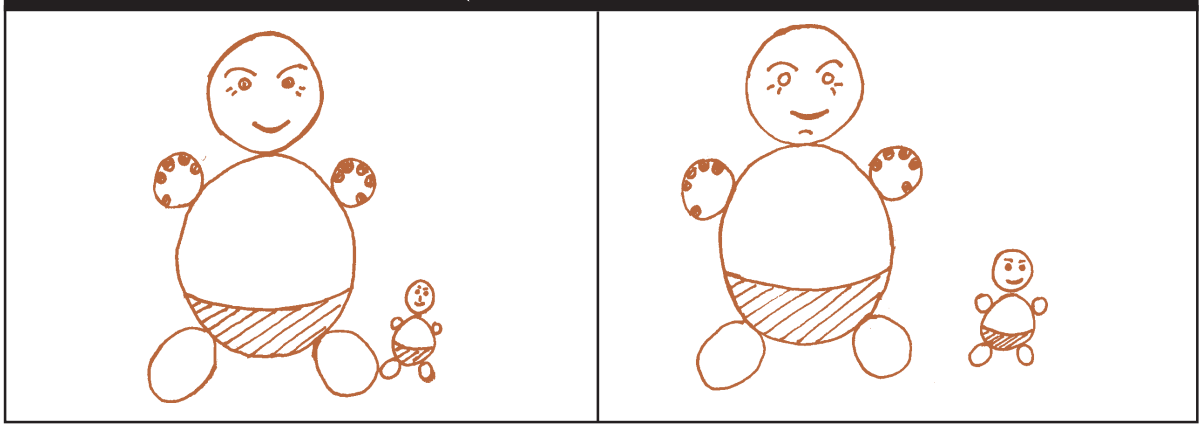

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল রা খা রা

(২) ণী বা না ব

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) মো দ হ ন ম ন

(২) অ ন্দ নি সু র ন্দ্য

২১ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) বিবেকানন্দ (২) রজনীকান্ত

২১ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) তদারকি (২) শাহেনশা

উত্তরদাতার নাম

(১) রূপঙ্কর পর্বত, জগদ্দল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (২) অনুশ্রী হালদার, ট্যাংরা, কলকাতা-৪৬ (৩) শুভম্ দে, ছাতনা, বাঁকুড়া (৪) পূজা সরকার, হলদিবাড়ি, কোচবিহার

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

ই-কমার্সের দৌলতে শিল্পপতি হচ্ছেন মহিলারা

রিনি রায়

দেবী লক্ষ্মী ভারতীয় সংস্কৃতিতে দু'ভাবে উপস্থাপিত— (১) সম্পদের প্রতীক, (২) গৃহকর্মে নিপুণা, যত্নশীলা গৃহিণীরূপের সমার্থকরূপে— তাই তো বাংলা শব্দভাণ্ডারে 'লক্ষ্মীমন্ত' শব্দটির সংযোজন ঘটেছে কালের বিবর্তনে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই প্রবাদগুলোর অর্থ হয়তো পরিবর্তিত হতে বসেছে। আধুনিকা ভারতীয় নারীর 'কেবলমাত্র লক্ষ্মীমন্ত' রূপটি পরিবর্তিত হয়ে সুগৃহিণী' থেকে সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে। সাংসারিক চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও আজ সে নিজের ঘরের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতেও অবদান রাখছে। নিজের সৃজনশীলতা এবং পেশাগত মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে গৃহিণী থেকে হয়ে উঠছে ব্যবসায়িক সংগঠনের পরিচালক। আর এর নেপথ্যে অবদান রয়েছে আন্তর্জাল (internet) এবং প্রযুক্তির। হাতে স্মার্টফোন বা ঘরে কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ থাকলেই অন্তর্জালের মাধ্যমে শাড়ি বা অন্যান্য পোশাক, অ্যাকসেসারিজ (পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আনুষঙ্গিক সাজগোজের জিনিস), হস্তশিল্প, গৃহস্থালির টুকিটাকি জিনিস, সাজগোজের জিনিস আঞ্চলিক ও দেশীয় সীমা পার করে পৌঁছে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রেতার কাছে। আর এই সামগ্রিক ব্যবস্থাটির মূলে রয়েছে অনলাইন ব্যবসা বা ই-কমার্স। এই ই-কমার্সই ভারতে বহু আলোচিত নারীর ক্ষমতায়ন (উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট)-এর ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে। সংসার সন্তান সামাল দিতে গিয়ে ব্যবসায়িকভাবে অথবা নিজের তৈরি জিনিসের সাহায্যে অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়ানোর ইচ্ছাটা নারীর মনে সুপ্তই থেকে যায়। তাছাড়া সংসারের জন্য বরাদ্দ সময় থেকে লম্বা সময় বার করে দোকান দেওয়ার জন্য একাধারে আর্থিক সঙ্গতি বা সময় সবসময় পাওয়া যায় না। কিন্তু আন্তর্জালিক দুনিয়ায় এসবের কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাটই নেই। বাড়ির চৌহদ্দির সীমানা

সুচী মুখার্জি

সাবিনা চোপড়া

রিচা কর

পার না করেই ব্যবসার একটা বড় বাজার এবং সুযোগ তৈরি করছে ই-কমার্স। ইকোনমিক টাইমস্-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী আমাজন, স্ন্যাপডিল এবং ফ্লিপকার্ট-এর মাধ্যমে হাজার হাজার মহিলা আর্থিক স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছে।

বেঙ্গালুরু কেন্দ্রিক ফ্লিপকার্ট মার্কেট প্লেসের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অঙ্কিত নাগেরির

অনিশা সিং

দেওয়া তথ্যানুযায়ী তাদের ৩০ হাজার তালিকাভুক্ত ক্রেতার ২০ শতাংশই মহিলা, যাদের মধ্যে আবার ১৫ শতাংশ মহিলাই ক্রেতা থেকে বিক্রেতায় পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মধ্যবয়স্কা নমিতা জৈনের কথা যিনি অল্প পুঁজি দিয়ে ব্যবসা শুরু করে আজ একজন নিয়োগকর্ত্রীতে পরিণত হয়েছেন। দিনপ্রতি প্রায় ৪০০ অর্ডার সরবরাহ করেন তিনি (ইকোনমিক টাইমস্ এর তথ্যানুসারে), অনলাইন শপিং সাইটগুলি ছাড়াও ফেসবুক, হোয়াট্স অ্যাপেও সমানতালে চলে নিজেদের পণ্যের প্রচার। ভারতের নামকরা শপিং সাইটগুলির অনেকগুলিরই মালকিন নারীরা। সুচি মুখার্জি (লাইমরোড. কম), রিচাকর (জিভামি. কম), অনিশা সিং (মাইডালা. কম), সাবিনা চোপড়া (যাত্রা. কম)। ই-কমার্স ক্ষেত্রে যত বাড়ছে, তত দ্রুত গতিতেই মহিলা ব্যবসায়ীর সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে। টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার তথ্যানুসারে ২০১৩ সালের মধ্যে মহিলা প্রভাবিত এই বিক্রিবাটার পরিমাণ ৮.৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। ইন্টারনেটের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে এই অনলাইন ব্যবসায় ক্রেতা-বিক্রেতা হিসাবে যুক্ত হচ্ছে শহরতলি ও গ্রামের মেয়ে-বউরাও। বি. আর. আম্বেদকর একদা বলেছিলেন, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved"— বর্তমানে মহিলা ব্যবসায়ীর এই সংখ্যা বৃদ্ধি সত্যই ভারতের প্রগতির এক অগ্রগতির চিহ্ন। ▌

যতদিন না রাজ্যসভার সংখ্যাতত্ত্ব বদলায় মোদীনমিক্সের বদলে ‘জোগাড়নমিক্স’-কেই কাজে লাগাতে হবে

অতিথি কলম

জয় পন্ডা

২০১৪ সালের বিধ্বংসী নির্বাচনী ফলাফলের পর দেশে-বিদেশে অনেকেই ভেবেছিলেন ভারতে এইবার এক নতুন অর্থনৈতিক যুগের সূচনা হতে চলেছে। তাঁরা এই বিশেষ অর্থনৈতিক ধারার একটা নামও ঠিক করে ফেলেছিলেন ‘মোদীনমিক্স’ (Modi + Economics)। অবশ্য এই বিশেষ মডেলের অর্থনৈতিক নামকরণের পূর্বসূরীরাও ইতিহাসে এবং বর্তমানেও রয়েছেন। যেমন ১৯৮০’র দশকের আমেরিকায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগানেরও তাঁর ধারায় অর্থনীতি পরিচালনার প্রণালী ‘Regenomics’ বলেই চিহ্নিত হয়েছিল। তেমনি আজকের জাপানের অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবের অনুসৃত অর্থনৈতিক

> “এমনটা নয় যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনোই পরিবর্তন আসেনি। বিশ্বব্যাঙ্কের বাৎসরিক সূচিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ সংক্রান্ত যে তালিকা প্রকাশ করা হয় তাতে ভারত গৌরবান্বিতভাবে ১২টি দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।”

পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডগুলি Abenomics বলেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত। ঠিক একইভাবে, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মোদীর দেওয়া তীব্র আশাব্যঞ্জক ভাষণগুলিও যুগপৎ গুজরাটে দীর্ঘদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর উন্নয়নের খতিয়ান মানুষকে তাঁর কাজের নিজস্বতার ওপর ভরসা রাখতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সকলেই দেখলেন গত তিন দশকে একক দল হিসেবে ঐতিহাসিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও মানুষের রায় নিয়ে সংসদে গেলেও তাঁর সরকারের অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডাগুলি কীভাবে একের পর এক সংসদের কাজকর্ম স্থগিত করে বানচাল করে দেওয়া হলো।

এর মানে অবশ্যই এমনটা নয় যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনোই পরিবর্তন আসেনি। বিশ্বব্যাঙ্কের বাৎসরিক সূচিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ সংক্রান্ত যে তালিকা প্রকাশ করা হয় তাতে ভারত গৌরবান্বিতভাবে ১২টি দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রের যে সূচক World Economic Forum বাৎসরিক প্রকাশ করে থাকে সেখানেও ভারত আরও ভাল ফল করে আগের অবস্থানের থেকে ১৬ ধাপ এগিয়ে গেছে। বস্তুত বিগত ৫ বছরে এই তালিকায় দেশের অবস্থান ক্রমশই নিম্নগামী ছিল। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

তবুও এগিয়ে যাওয়ার যে চোখ ঝলসানো দ্যুতি তা কিন্তু অর্জিত হয়নি—যা থেকে বলা যায় এবার এক নতুন যুগের শুরু হলো। একারণেই প্রশ্ন আসে এক্ষেত্রে সরকারের কী করণীয়। সরকারের ওপর সংসদকে এড়িয়ে বেশ কিছু ordinance পাশ করিয়ে তাৎক্ষণিক আইনজারি করার যে দোষারোপ করা হচ্ছে তা আদৌ যথোপযুক্ত নয়। ইতিহাস বলছে নেহরুর আমল থেকেই এই চলতি সরকার পর্যন্ত সকলেই বছরে ন্যূনতমপক্ষে ১০টি অধ্যাদেশ জারি করার সংস্কৃতি অনুসরণ করে চলেছে।

এখানেই আসছে অত্যন্ত কালোত্তীর্ণ একটি ভারতীয় পদ্ধতির কথা ‘জোগাড়’। উত্তর ভারতে ভীষণভাবে প্রচলিত এই শব্দটির ওপর বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। Wikipedia অনুযায়ী জোগাড় বলতে “a colloquial Hindi & Punjabi word that can mean on innovative fix... used for solutions that bend rules or a resource that can be used as such, or a person who can solve a compli-

ফঃ ৪

cated issue." দু' একটা উদাহরণ দিলে এ বিষয়ে আমাদের বিস্ময়কর নৈপুণ্যের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে :

জামাকাপড় কাচার মেশিনকে বেশি পরিমাণ দইয়ের লস্যি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রয়োগের নজির প্রচুর আছে। অতটা উন্নত প্রযুক্তি নেই এমন হাসপাতালে অপারেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় রোগীর চামড়া টেনে ধরে রাখতে কাগজ আটকানোর ক্লিপও ব্যবহার করা হয়েছে। এমন অত্যন্ত কুফলদায়ী তৎকালীন কাজ তুলে নেওয়ার ভারতীয় মৌলিক পদ্ধতির সংখ্যা নেহাত কম নয়। সেই কারণেই আন্তর্জাতিক গবেষণার ক্ষেত্রেও ভারতীয় 'জোগাড়ে'-এর অভিনবতা নিয়ে বহু গবেষণাপত্র ও বই প্রকাশ পেয়েছে। এই চর্চাকে কিন্তু আবিষ্কার, প্রযুক্তি ও ম্যানেজমেন্টের তকমা দিয়েই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তাই বলছি এই 'জোগাড়' তত্ত্ব আজ ভারতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সময় এসে গেছে। এই লেখার সময় লোকসভায় কোম্পানিদের দেউলিয়া ঘোষণা করা সংক্রান্ত এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কিন্তু অত্যন্ত জরুরি বিল পেশ করা হচ্ছে। এটি আইনে পরিণত হলে ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি ও দেনাদারদের পাওনা মেটানো অনেক সহজে হতে পারবে। প্রচলিত আইনের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অসাধু করপোরেটেরা আইনটির পূর্ণ অসদ্ব্যবহার করছে। কিন্তু এই বিলটির মধ্যে একটি নক্সা লুকনো আছে। বিলটি কার্যকরী করতে গেলে কর আইন, শুল্ক আইন, কাস্টম আইনের মতো আরও বেশ কয়েকটি বলবৎ আইনের ধাঁচে পরিবর্তন আনতে হবে। ফলে চরিত্রগতভাবে বিলটি 'মানি বিল'-এরই চেহারা নেবে, ফলে এটিকে আর রাজ্যসভায় পাশ করাবার দরকার পড়বে না।

অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি গত আগস্ট মাসে এই ধরনের ঘুরপথে যাওয়ার ইঙ্গিত প্রথম দিয়েছিলেন যখন রাজ্যসভার অচলাবস্থা কাটাবার তাঁর সব রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বিরোধীপক্ষ সহযোগিতা দূরস্থান, অনড় মনোভাব নেয়। বিশ্বের অন্য আরও বহু গণতান্ত্রিক সরকার যেখানে উভয়কক্ষ সংবলিত বাই ক্যামেরলি আইনসভা (উচ্চকক্ষ- নিম্নকক্ষ) চালু আছে তারা এই ধরনের সমস্যার সমাধানের রাস্তা নিজেদের সংবিধান সংশোধন করে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। হয় তারা যে কক্ষের সদস্য অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বা মনোনীত হয়ে আছেন তাদের ক্ষমতা কাটছাঁট করেছে নয়তো আমেরিকার মতো উভয়কক্ষের সদস্যদেরই তারা যে দলেরই হোক সরাসরি জনতার ভোটে জিতে আসার নিয়ম চালু হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের কথা, এই প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রসঙ্গেও বিরোধীরা চরম একরোখা মনোভাব দেখাচ্ছে। এই বিষয়ে সংস্কার সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনাতেই তারা ক্ষেপে উঠছে। বলা দরকার লোকসভার একজন সদস্য হিসেবে এই কলামেই আমি এর আগে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। পরিণতিতে রাজ্যসভার ৬ জন মান্যগণ্য সদস্য সংসদে আমার বিরুদ্ধে privilege ও contemp motion ফাইল করেছেন, যাতে কোনো আলোচনার সূত্রপাতই না হয়।

এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার যদি উপায়ান্তর না পেয়ে দেশের স্বার্থে কোনো বিলকে কৌশলে অর্থ বিলের চেহারা দেয় যাতে রাজ্যসভা ছাড়াই সেটি আইনে পরিণত হতে পারে সেক্ষেত্রে কাজটিকে কী চোখে দেখা হবে। এটিই কিন্তু 'জোগাড়' কথাটির প্রত্যক্ষ ফলিত রূপ। বিলটিকে এভাবে পাশ করানো অবশ্যই দেশের কল্যাণে। আইনজ্ঞ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছ থেকে জানা গেছে প্রক্রিয়াটি আইনসিদ্ধ। অবসরপ্রাপ্ত আমলা, সংবিধান বিশেষজ্ঞ মহলের অনেকেই একই মত পোষণ করেছেন। অন্যদিকে, সমালোচকরা পদ্ধতির সঙ্গে সহমত না হলেও এটিকে আইনসিদ্ধ নয় এমন বলেননি।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে লোকসভার অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল P.D. Acharya জানাচ্ছেন সংবিধান অনুযায়ী কোনো অর্থবিলের মধ্যে অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ছাড়া অন্য কোনো সংযোজন থাকবে না, কিন্তু একই সঙ্গে বলেছেন বিষয়টি শেষাবধি স্পিকারের এক্তিয়ারভুক্ত। তিনিই ঠিক করবেন বিলটি অর্থবিল হিসেবে যাবে না অন্য কিছু থাকার ফলে তার চরিত্রভ্রষ্ট হবে। একই নিঃশ্বাসে তিনি বলেছেন, অধ্যক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখবেন অর্থ বিল ও অন্যান্য বিলের মূলগত পার্থক্যের সংবিধানগত বাধ্যবাধকতাগুলি। এর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিও থাকা উচিত যাতে তাঁর কাজ সহজ হয়।

এই চুলচেরা বিচারের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষেরই চূড়ান্ত নির্ধারণ ক্ষমতার উদাহরণ দিতে সেক্রেটারি জেনারেল PD Acharya ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রসঙ্গ টেনে নেহরুরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ''It is now clear and beyond the possibility of dispute that the speaker's authority is final in declaring that a bill is a money Bill. When the speaker gives a certificate to this effect, this can not be challenged. The speaker has no obligation to consult any-one incoming to a decesion".

এটা খুবই স্বাভাবিক আজকের নেহরুর উত্তরসূরীরা অবশ্যই অধ্যক্ষের অবস্থানের বিরোধিতা করবেন। নানান অছিলায় আইনি ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সহজপন্থা নেবেন যাতে সরকারের প্রচেষ্টাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলা যায়। তবে মনে হচ্ছে সরকার তার হোমওয়ার্ক কিছুটা এগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বিগত লোকসভা যেমন দীর্ঘদিন অচল ছিল এবার শাসকদল অন্য রাস্তায় গিয়ে সেই বিকলাঙ্গতা দূর করার পথ নেবে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

শেষে বলছি 'জোগাড়' কখনই আদর্শ সমাধান নয়। কঠিন সময়ে কাজ সমাধা করতে এর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে যতদিন না রাজ্যসভার সংখ্যাতত্ত্ব পাল্টাচ্ছে আর 'মোদীনমিক্স'ও লাগু হতে পারছে না ততদিন 'জোগাড়নমিক্স' এর বিকল্প নেই।

(লেখক বিজেডি-র সাংসদ)

অস্পৃশ্যতা যদি দোষের না হয় তবে পৃথিবীতে দোষ বলে কিছু নেই : বালাসাহেব দেওরস

বর্তমান বছরে ‘বসন্ত ব্যাখ্যানমালা’ ভাষণ দেওয়ার জন্য আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ করে যে গৌরব প্রদান করেছেন এবং নিজের মত ব্যক্ত করার অবসর দিয়েছেন, তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ।

এখানকার আয়োজকরা আমাকে কয়েকটি বিষয় চয়ন করার জন্য বলেছিলেন, তার মধ্যে ‘সমাজিক সমতা ও হিন্দু সংগঠন’—এই বিষয়টি চয়ন করেছি। কারণ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এবং হিন্দু সংগঠনের দৃষ্টিতে এই বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য হিন্দু সংগঠন অনিবার্য। সুতরাং এই সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে সামাজিক সমতার বিষয়টি স্পর্শকাতর ও সময়োপযোগী হওয়ার কারণে আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

হিন্দু কে? হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যা কী? এর উপর অনেক বার অনেক বিতর্ক খাড়া করা হয়েছে। সেই অনুভব আমাদের আছে। হিন্দু শব্দের অনেক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই পরিপূর্ণ নয়। কারণ সব ব্যাখ্যার মধ্যে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ আছে। সর্বমান্য ব্যাখ্যা নেই। শুধু এই কারণে হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাবে কি? আমি মনে করি, হিন্দু সমাজ আছে এবং এর অন্তর্গত কোন্ কোন্ সমাজ, সেই সম্পর্কে সমস্ত মানুষের সর্বমান্য ধারণা আছে, যা অনেক বার অনেক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু বছর পূর্বে সরকার ‘হিন্দু কোড’ তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহরু ও ড. আম্বেদকর অগ্রণী ছিলেন। দেশের বহুসংখ্যক মানুষের জন্য যে বিধি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে তাকে প্রাথমিক ভাবে ‘হিন্দু কোড’ নাম দেওয়া হয়েছে এবং এই বিধি কাদের ক্ষেত্রে লাগু হবে একথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে মুসলমান, খৃষ্টান, পারসি ও ইহুদি ছাড়া বাকি সবলোক অর্থাৎ সনাতনী, আর্যসমাজী, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরবর্তীকালে এটাও বলা হয়েছে যে এই সমস্ত সমাজের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেউ যদি মনে করেন যে এই বিধি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তবে তাঁকেই সেটা প্রমাণ করতে হবে।

তাঁদের মাথায় এই চিন্তা এল কেন? তাঁদের মনে হয়েছে যে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে সব বন্ধুদের জন্য সর্বসমাবেশক শব্দ ‘হিন্দু’। তাই ‘হিন্দু’ শব্দ উচ্চারণ করলেই এই সব লোককেই বোঝায়, এই কথা মাথায় রেখেই আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করব।

আমরা সমস্ত হিন্দুকে সংগঠিত করতে চাই। সংগঠন মানে বাহিনী বা সভা নয়। সভায় লোক একত্রিত হয়, সংগঠনেও লোক একত্রিত হয়। ভালো কথায় বললে সংগঠনে মানুষকে একত্রিত আনতে হয়। একজায়গায় আসার পর মিলেমিশে কীভাবে থাকবে, কেন থাকবে তার চিন্তা করতে হয়। এই একতার ভিত্তি কী হতে পারে?

এই দেশ আমাদের মাতৃভূমি। আমরা তাঁর পুত্র। হাজার হাজার বছর ধরে এক সঙ্গে বসবাস করছি। এই দীর্ঘ কালখণ্ডে আমরা অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছি। এর ভিত্তি ভাবাত্মক, কিন্তু এটাই কি পর্যাপ্ত? এই ভাবনার সঙ্গে কোনো ব্যবহারিক অংশ থাকা আবশ্যক? সব মানুষের মধ্যে ‘আমরা সব এক’ এই বোধ থাকা যেমন আবশ্যক, সেইরকম প্রত্যক্ষ ব্যবহারে একতার অনুভব সর্বদা সহজভাবে হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের দৈনন্দিন ব্যবহারে যতক্ষণ পর্যন্ত ‘একতা’র অনুভব না আসছে, ততক্ষণ একতার ভিত্তি মজবুত ও চিরস্থায়ী হতে পারে না। যদি আপনারা এইরকম ভাবেন এবং আমার বিশ্বাস আপনারা এইভাবেই ভাবছেন, তাহলে আমাদের ঘাটতি কোথায়— তার বিচার করা আবশ্যক।

বিগত অনেক শতাব্দী ধরে মুষ্টিমেয় মুসলমান ও ইংরেজ এই দেশ শাসন করেছে। আমাদের অনেক বন্ধুকে ধর্মান্তরিত করেছে।

আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, সবর্ণ-অস্পৃশ্য ভেদ সৃষ্টি করেছে। এই ব্যাপারে আমরা ওই সমস্ত লোকদের দোষ দিয়েই দায়িত্ব মুক্ত হতে পারি না। বিদেশি শাসনকালে তাদের বুদ্ধিভেদের জন্যই হয়েছে— কেবল এরূপ ভাবলেই কি হবে? অন্য সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে আজ নয় কাল সম্পর্ক হবেই। বার্লিনে যে নকল প্রাচীর দেওয়া হয়েছিল— তা হওয়ার কথা ছিল না। প্রাচীর তো সেই দেয়, যে অপরের চিন্তা ও দর্শনকে ভয় পায়। দুটি পদ্ধতি একসঙ্গে চলার মধ্যেই শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পায়। যে পদ্ধতি ভয়ের কারণে নিজের চারদিকে প্রাচীর খাড়া করে সে তো নিজের হীনতা স্বীকার করে নেয়। সুতরাং অন্য লোকদের দোষারোপ করার চেয়ে অন্তর্মুখী হয়ে নিজেদের কোন্ দোষের জন্য তারা লাভ উঠিয়েছে তার বিচার করতে হবে। এরজন্য সামাজিক বিষমতাও কারণ— তা স্বীকার করতে হবে। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা—এগুলি সামাজিক বিষমতার ফল। আজও সমাজে বিচরণ করার সময় এই সমস্ত প্রশ্ন আমাদের ধাক্কা দেয়--- আমাদের সকলেরই এই অনুভব আছে।

আমরা আমাদের সংস্কৃতির প্রতি খুবই গর্বিত— যা অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। আমাদের আশা, সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজ নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি স্বাভিমানী হোক। আমরা বিশ্বাস করি--- হিন্দুকে যদি সত্যিকারের হিন্দু হয়ে বাঁচতে হয় তাহলে নিজেদের সংস্কৃতির শাশ্বত মূল্যবোধগুলি যা দীর্ঘকাল ধরে বহু আঘাত ও ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক উথাল পাথালের মধ্যেও টিকে আছে, সেই পরম্পরাকে ছাড়লে চলবে না। এটা চিন্তা করা খুবই উচিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয়--- যা পুরনো তাই সোনা, তা অপরিবর্তনীয় ও শান্তশুদ্ধ।

'পুরাণমিত্যের ন সাধু সর্বম্'—অর্থাৎ যা পুরনো তাই ভালো, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। এরকম ভাবাও ঠিক নয়— যে কথা আমরা এতদিন ধরে বলে আসছি, আজ নতুনভাবে ভাববার দরকার কী? 'তাতস্য কুপোঽয়মিতি বরুংবাণাঃ ক্ষারং জলম্ কাপুরুষাঃ পিবন্তি' অর্থাৎ এই কুয়ো আমার বাবার, তার জল নোনতা তো কী হয়েছে। উনি তো এই জলই সারাজীবন খেয়েছেন, কিছুতো খারাপ হয়নি। সুতরাং আমরাও ওই জলই পান করব এইরকম দুরাগ্রহ থাকা ঠিক নয়। কিন্তু সমাজে অনেক প্রকার লোক থাকে। একশ্রেণীর লোক নতুন মতকে স্বীকার করতে প্রস্তুত আবার অন্য শ্রেণীর লোকেরা পুরনো ধারণাকে ধরে রাখতে চায়। 'পরীক্ষান্যতরৎ ভজন্তে'— এরকম বিচার করে অর্থাৎ কষ্টিপাথরে যাচাই করে বিবেক ও বুদ্ধির দ্বারা কোনো বস্তু ত্যাগ অথবা গ্রহণ কারাই উচিত হবে— এরূপ মানসিকতা অধিক প্রয়োজন। অধিকাংশ লোক এই পদ্ধতিতে ভাবনা ও ব্যবহার করতে প্রস্তুত হোক— সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

আমার জানা আছে যে ইহুদিরা নির্দিষ্ট কালখণ্ডের পরে বার বার নিজেদের ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মীয় আচার বিচার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, পুনর্মূল্যায়ন করেছে। ধর্মগ্রন্থে শব্দ বদল করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারা নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করেছে (Interpretation)। প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও এই প্রকার ধর্মচিন্তন, ধর্মমন্থন করা হোত। তাঁরা এটাও বিচার করে থাকবেন যে আমাদের ধর্মের কোন অংশ শাশ্বত ও কোন অংশটি পরিবর্তনশীল। নাহলে এতগুলি স্মৃতিগ্রন্থ তৈরি হতে পারত না। দেবতাদের মধ্যেও পরিবর্তন হয়েছে। ঋক্‌বেদের ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার জায়গায় বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা চালু হয়েছে। শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে শত্রুতাপূর্ণ ব্যবহার ছিল কিন্তু আদি শঙ্করাচার্য সমন্বয় স্থাপিত করে পঞ্চায়তন পূজা প্রচলন করেন। এখন তো ঘরে ঘরে শিবরাত্রির সঙ্গে শয়ন ও প্রবোধিনী একাদশী ব্রত পালন করা হয়। প্রাচীন গ্রন্থ বা পুরাণে যে সমস্ত গল্পগাথা বর্ণিত রয়েছে তা আমরা হুবহু মানতে রাজি নয়। পুরাণে চন্দ্রগ্রহণের গল্প আছে। রাহু চাঁদকে গিলে নেয়, তাই চন্দ্রে গ্রহণ লাগে। সুতরাং পাঠশালায় চন্দ্রগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা কি এই গল্পের অবতারণা করি? এমন কথা নেই যে কট্টরবাদী বা ধর্মগ্রন্থে লিখিত শব্দ অনুসারে বিশ্বাস ও আস্থা রাখার মতো লোক আমাদের দেশে বহু আছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতে একটি মজার মামলা হয়েছিল (Readers' Digest-July 1962)। ওখানকার একটি রাজ্যে কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। তার উপর অভিযোগ ছিল যে বাইবেলে সৃষ্টি ও মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে গল্প আছে তার বিরুদ্ধে তিনি বিবর্তন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাকে শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে খৃষ্টান লোকেরা বাইবেলে বর্ণিত ওই গল্পের অমান্য করছে। কিন্তু তারা বাইবেলকে অশ্রদ্ধা করছে না। একথা অবশ্য মনে রাখার মতো। অনেক বিষয় ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন— এইরকম কিছু লোক মানেন। তা অপরিবর্তনীয় একথা সবাইকে বোঝানো তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই বলেছেন— 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। ধর্মের গ্লানির পর ধর্মস্থাপনা করার অর্থ এটাতো নয় যে— পুরনো জিনিসকে নতুন করে চালু করা, সেখানে কোনো পরিবর্তন হবে না। শেষ পয়গম্বরের কথায়— 'আমিই শেষ অবতার'— এরকম তো কেউ বলেনি। প্রাণতত্ত্ব তো পুরনো হবেই, কারণ তা শাশ্বত ও সনাতন। কিন্তু তার অনুভব ও অভিব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে। এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো উচিত।

প্রাচীনকালে যে ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল তা সমসাময়িক কালের আবশ্যকতা অনুসারে হয়েছিল বলে আমার মনে হয়। আজ যদি তার প্রয়োজন না থাকে, তার উপযোগিতা সমাপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ত্যাগ করা উচিত। যদি আমাদের বর্ণব্যবস্থার কথাই ধরি তাহলে দেখব যে সমাজে চার প্রকার কাজ সমাজ রচনার জন্য প্রয়োজন— এটা ভেবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যক্তিসমূহের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি দেখে এই ব্যবস্থা নির্মাণ হয়েছিল। ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণী বিভাগ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তার মধ্যে ভেদাভেদের কল্পনা কখনই ছিল না। কিছু বিদ্বান লোকের মতে শুরুতে বর্ণব্যবস্থা জন্মগত ছিল না। পরবর্তীকালে এই বিশালদেশে ও জনসমুদায়ে ব্যক্তি গুণমানকে কীভাবে চেনা যায় তা বিচারবান

মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে। কোনো বিশিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতির অভাবের কারণে জন্ম থেকেই বর্ণব্যবস্থা স্বীকার করা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু তার মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদভাব ছিল না। বরং এই ব্যবস্থা 'সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ'রূপী বিরাট সমাজের অবয়ব— এরকম উদাত্ত কল্পনা এর পিছনে রয়েছে। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে ব্যবস্থার মধ্যে পায়ের চেয়ে জঙ্ঘা শ্রেষ্ঠ, জঙ্ঘার চেয়ে হাত, বা হাতের চেয়ে মাথা শ্রেষ্ঠ— এই প্রকার বিপরীত ও হাস্যাস্পদ ভাবনা কখনও ছিল না। এই কারণে একসময় এই ব্যবস্থা সর্বমান্য ছিল ও কিছুকাল পর্যন্ত সুচারু রূপে চলেছিল। এরজন্য কিছু checks ও balances -এর ব্যবস্থা ছিল। জ্ঞান-শক্তিকে পৃথক করা হয়েছিল। তাকে সম্মান দেওয়া হয়েছিল, সঙ্গে দারিদ্র্যও দিয়েছিল। দণ্ডশক্তিকে পৃথক করা হয়েছিল। এবং ধনশক্তি থেকে দূরে রেখেছিল। ধনশক্তিকে দণ্ডশক্তির সঙ্গে মিলতে দেয়নি। এইরকম যতক্ষণ check and balance ঠিকমতো চলেছে ততদিন এই ব্যবস্থা সুচারু রূপে চলেছে। পরে এইদিকে দুর্লক্ষ্য হওয়ার জন্য বা অন্য কারণে এই ব্যবস্থা ভেঙে গিয়েছে।

মানুষ জন্ম থেকে বা বংশানুক্রমিকভাবে গুণসম্পন্ন হয়— এই ভাবনা পূর্বপুরুষদের ছিল। সেই সময় তাঁরা জন্মগত গুণের মর্যাদা বুঝেছিলেন। তাই 'শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান ব্রাহ্মণো ভবেৎ। ব্রাহ্মণোঽপি ক্রীয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ'— এরকম বলেছেন বা 'জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ'—জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণ হয়, এটা বলা ঠিক নয় বলে উদাহরণ দেওয়া যায়— ঋষ্যশৃঙ্গ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য প্রমুখ অন্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করেও ধর্মাচরণের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে শূদ্রমাতার পুত্র মহীদাস নিজ গুণে দ্বিজ হয়েছেন এবং 'ঐতরেয়' ব্রাহ্মণের রচনা করেছেন। পিতৃপরিচয়হীন জাবালার উপনয়ন সংস্কার করে তাঁর গুরু তাঁকে দ্বিজ বানিয়েছেন— উপনিষদে এই গল্প প্রসিদ্ধ। প্রাচীন পদ্ধতিতে আবশ্যক নমনীয়তার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু বর্তমানে অনেক কারণে পরিস্থিতি পুরোপুরি বদল হয়েছে। তাই নতুন কাল বা নতুন যুগ অনুসারে বিচার করা উচিত। মুদ্রণ ব্যবস্থার জন্য পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষালয়ে জ্ঞান অর্জন শুরু হয়েছে। যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য কুটীর শিল্পের কাজ কারখানাতে হচ্ছে। নতুন আবিষ্কার হয়েছে। নতুন বিজ্ঞানের যুগ এসেছে। এই কারণে বংশানুক্রমিকতার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অন্য বিষয়ের গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

একথা ঠিক যে প্রাকৃতিক কারণে বা বংশপরম্পরার কারণে কিছু বিষমতা তৈরি হয়। কিন্তু বিষমতাকে নিয়ম বানানো ঠিক নয়। প্রকৃতি দ্বারা তৈরি বিষমতাকে মানুষ যদি স্থায়ী করার চেষ্টা করে তো সেটা কোনো মহানতার কাজ নয়। তাই মানুষকে প্রকৃতির নিয়ম অধ্যয়ন করে বিচার করে দেখতে হবে, প্রাকৃতিক বিষমতা কীভাবে দূর করা যায়, কীভাবে মানুষের সহনীয় করে তোলা যায়। বিষমতা সবার সামনে প্রচার করানো উচিত নয়। দুর্বল অথবা গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শিশুকে সবরকম সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা বিশ্বের সব উন্নত সমাজ করে থাকে। যদি কোনো বিশেষ জাতির পরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণে ন্যূনতা এসে থাকে তাহলে এই ব্যবস্থা টিকবে না। ওই ন্যূনতাকে বংশানুক্রমিক বা প্রাকৃতিক বলে সমর্থন করলে আজকের দিনে ভুল হবে। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণের বা অন্য ব্যবস্থার দ্বারা বংশপরম্পরায় চলে আসা গুণ বদলে দেওয়া যায়। জাপানের লোকেরা বেঁটে হয়, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার মানুষের সঙ্গে মেলামেশার কারণে জাপানিদের চলাফেরা ও খাদ্যাভ্যাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এতে তাদের গড় উচ্চতাও বেড়ে গেছে। একথা সর্বজনবিদিত। প্রথমে নিজের দেশে বা অন্যদেশে কিছু জাতিকে মার্শাল বলার রীতি ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এত ব্যাপক আকারে হয়েছিল যে সম্পূর্ণ সৈনিকীকরণ অথবা সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করেই বড় বড় সেনাদল খাড়া করতে হয়েছিল এবং আমরা জানি এরা সবাই সত্যিকারের সৈন্যের মতোই যুদ্ধ করেছিল।

বাস্তবে যদি দেখি আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সমাজকে টিকে রাখার জন্য আবশ্যক জন্মগত বর্ণব্যবস্থা অথবা জাতি-ব্যবস্থার আজ কোনো অস্তিত্ব নেই। সর্বত্র অব্যবস্থা, বিকৃতি দেখা যাচ্ছে। আজ এই ব্যবস্থা কেবল বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত সীমিত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নেই, কেবল কঙ্কাল পড়ে আছে। ভাব চলে গেছে, কাঠামো পড়ে আছে। প্রাণ বেরিয়ে গেছে, হাড়গোড় পড়ে আছে। সমাজ ধারণের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। সুতরাং সকলে মিলে বিবেচনা করতে হবে— যা সমাপ্ত হওয়া উচিত, যা নিজে থেকেই হচ্ছে, তা যেন ঠিক পদ্ধতিতে সমাপ্ত হয়।

আমাদের এখানে 'রুটি-বেটি-ব্যবহার' শব্দ প্রচলিত আছে। প্রথমে রুটি-ব্যবহার জাতির মধ্যেই সীমিত ছিল, কিন্তু এখন এই বন্ধন আলগা হয়ে সব জাতির মধ্যে চালু হয়ে গেছে। তাই জাতিভেদের মানসিকতা ক্রমশ কমছে। বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বেটি- ব্যবহারও

হিন্দু সমাজের কোনো শ্রেণীকে অন্যায় বা অত্যাচারের প্রতিভূ মনে করে অপমান করা, মনে ব্যথা দেওয়া ও হতোদ্যম করা কখনও ঠিক নয়। তাদের মনোবল ঠিক রেখে, নতুন রকমের সামাজিক ব্যবহারের উদাহরণ বা আদর্শ সামনে রাখা আবশ্যক। বস্তুত, সবাই হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ।

শুরু হয়ে গেছে। এটা যদি অধিক মাত্রায় চলতে থাকে তাহলে জাতিভেদ সমাপ্ত হয়ে সামাজিক সমতা নির্মাণের পক্ষে সহায়ক হবে--- একথা স্পষ্ট। সুতরাং রুটি-বেটি-ব্যবহার— এই বন্ধনকে আলগা করাটা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু বেটি-ব্যবহার রুটি-ব্যবহারের মতো সহজ নয়। একথা মাথায় রেখে, সংযম বজায় রেখে অনুকূল আচরণ করতে হবে। বিবাহের কথা উঠলেই ভালো দম্পতির কথা বিবেচনা করাই স্বাভাবিক। বিবাহ শিক্ষাগত, আর্থিক ও জীবন রচনার সমানতার ভিত্তিতেই হবে। যেভাবে লোকেদের মধ্যে পাশাপাশি ঘর বানিয়ে থাকার প্রবণতা বাড়বে, সমান শিক্ষা ও সুবিধাসহ জাতি-নিরপেক্ষ আর্থিক স্তর উপরে উঠবে, সেইভাবেই স্বাভাবিক একরূপতা সম্ভব হবে। আইন করে বা পয়সার লোভ দেখিয়ে এটা সম্ভব নয়। এটা তড়িঘড়ির বিষয়ও নয়, একথা সকলের মনে রাখতে হবে। সামাজিক পরিবর্তনের এই প্রয়াসে সকলের ব্যক্তিগত যোগদান থাকা চাই।

অস্পৃশ্যতা আমাদের সমাজে ভেদভাবের এক দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। বিচারবান লোকের মতে অতি প্রাচীনকালেও এর অস্তিত্ব ছিল না এবং কালের প্রবাহে বিভিন্ন প্রকারে সমাবিষ্ট হয়ে গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে যাই হোক, আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে অস্পৃশ্যতা এক মারাত্মক ভুল এবং একে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে (Lock, stock & Barrel)। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। আব্রাহম লিংকন দাসপ্রথা সম্বন্ধে বলেছিলেন— If slavery is not wrong then nothing is wrong, সেই রকম আমদেরও বলা উচিত— 'অস্পৃশ্যতা যদি দোষের না হয় তবে পৃথিবীতে দোষ বলে কিছু নেই।' সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের ধ্যেয় হওয়া উচিত— কীভাবে সামাজিক বিষমতা দূর করা যায়। লোকেদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে— বিষমতার কারণে কীভাবে সামাজিক দুর্বলতা এসেছে এবং সঙ্ঘর্ষ ঘটছে। একে দূর করার উপায় বলতে হবে এবং এই প্রয়াসে সমস্ত ব্যক্তির যোগদান থাকা চাই।

আমদের ধর্মগুরু, সন্ত, মহাত্মা ও বিদ্বানলোকেদের জনমানসে প্রভাব আছে। একাজে তাঁদের সহায়তা প্রয়োজন। পুরনো বিষয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা আছে এবং তা বজায় থাকুক এটা ঠিক কিন্তু তাঁদের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে উপদেশ বা প্রবচনের মাধ্যমে মানুষকে বলুন— আমাদের ধর্মের শাশ্বত মূল্যবোধ কোনটা, আর যুগানুকূলে পরিবর্তনশীল কোনটা। এইভাবে চললে তাঁদের বক্তব্যের অধিক ব্যাপক ও গভীর প্রভাব পড়বে। শাশ্বত অ-শাশ্বতর বিবেচনা যাঁরা করেন সেই আচার্য, মহন্তগণের কথা দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়া চাই। সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের এবং তার জন্য মঠের বাইরে বেরিয়ে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থেকেই পূর্ণ হবে— একথা তাঁদের বুঝতে হবে এবং তদনুরূপ কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সৌভাগ্যবশত এই বিষয়ে তাঁদের প্রয়াসের শুভ সংকেত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের স্বর্গত সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী সাধু-সন্তদের একসঙ্গে নিয়ে এসে, তাঁদের এই বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এরদ্বারা সুফল হলো যে অনেক ধর্মপুরুষ, সাধু সন্ত সমাজের বিভিন্ন অংশে ঘোরাফেরা করছেন এবং ধর্মান্তরিত বন্ধুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

সমাজের অন্য চিন্তাশীল মানুষেরও বড় দায়িত্ব আছে। তাঁদের এমন কিছু পদ্ধতি, পথ দেখানো উচিত, যাতে কাজ হবে কিন্তু সমাজে কটুতা উৎপন্ন হবে না। 'উপায়ং চিন্তয়ন প্রাজ্ঞঃ অপায়মপি চিন্তয়েৎ'— সমাজে সৌহার্দ্য, সামঞ্জস্য ও পরস্পরকে সহযোগিতা করার মতো পরিবেশ তৈরি করার জন্য সমানতা চাই, একথা ভুলে গিয়ে বা না বুঝে যিনি বক্তব্য রাখবেন, লিখবেন বা আচরণ করবেন, তিনি নিশ্চয়ই এই উদ্দেশ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করবেন।

হিন্দু সমাজের কোনো শ্রেণীকে অন্যায় বা অত্যাচারের প্রতিভূ মনে করে অপমান করা, মনে ব্যথা দেওয়া ও হতোদ্যম করা কখনও ঠিক নয়। তাদের মনোবল ঠিক রেখে, নতুন রকমের সামাজিক ব্যবহারের উদাহরণ বা আদর্শ সামনে রাখা আবশ্যক। বস্তুত, সবাই হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ। সুতরাং তাঁদের স্বাভিমান বজায় থাকুক— এটাও মনে রাখতে হবে। জাতি ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা বিলোপ করতে হলে যারা তা মানে, তাদের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হবে। যারা তা মানে তাদের প্রতি ঠাট্টা, সঙ্ঘর্ষ না করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে কাজ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি বলতেন— আমরা অস্পৃশ্যতা মানি না, পালন করারও দরকার নেই। সঙ্ঘশাখা ও তার কার্যক্রমের রচনাও তিনি সেইভাবেই করেছেন। তখনকার দিনেও কিছুলোক অন্যভাবে ভাবতেন কিন্তু ডাক্তারজীর বিশ্বাস ছিল যে, আজ নয় কাল সকলে এই ভাবনার সঙ্গে সহমত হবেই। তাই তিনি এই ব্যাপারে ঢোল পিটাননি বা কারও সঙ্গে ঝগড়াও করেননি, কারও বিরুদ্ধে অনুশাসন ভঙের অভিযোগও অনেননি। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে অন্য ব্যক্তিও সৎ মানসিকতাসম্পন্ন। কিছু অভ্যাসের কারণে আপাতত সঙ্কোচ করছে, সময় পেলে নিজের ভুল শুধরে নেবে। সঙ্ঘের প্রাথমিক অবস্থায় এক শিবিরে কয়েকজন বন্ধু মাহার শ্রেণীর বন্ধুদের সঙ্গে ভোজন করতে সঙ্কোচ করছিল। ডাক্তারজী তাদের শিবিরের নিয়ম বলে শিবির থেকে বের করে দেননি। সমস্ত স্বয়ংসেবক, ডাক্তারজী ও আমি একসঙ্গে খেতে বসলাম, যাদের সঙ্কোচ ছিল তারা আলাদা বসল, কিন্তু দ্বিতীয়দিন ভোজনের সময় সবাই একসঙ্গে বসল। এর চেয়েও বেশি জ্বলন্ত উদাহরণ আমার বন্ধু স্বর্গীয় পণ্ডিত বচ্ছরাজজী ব্যাস। তিনি যে শাখার স্বয়ংসেবক, আমি সেই শাখার মুখ্যশিক্ষক ছিলাম। তাঁর ঘরের পরিবেশ পুরনো ও কট্টর হওয়ার কারণে তিনি আমার বাড়িতে ভোজন করতেন না। যখন ইনি প্রথমবার সঙ্ঘ শিবিরে এলেন, তখন ভোজন নিয়ে সমস্যা হলো। সকলের সঙ্গে একত্র রান্না করা ভোজন এক পংক্তিতে বসে খাবেন না। আমি ডাক্তারজীকে বলতে তিনি সঙ্ঘের নিয়ম দেখিয়ে শিবিরে আসতে বাধা না দিতে

বললেন। কারণ তাঁর বচ্ছরাজজীর সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল যে ভবিষ্যতে অবশ্যই পরিবর্তন হবে। সুতরাং তিনি আমাকে বললেন বচ্ছরাজজী যাতে শিবিরে আসে। তাঁকে আলাদা রান্না করার অনুমতি দেওয়া হবে। প্রথম বর্ষ শিবিরে এই ব্যবস্থাই হলো, কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে বচ্ছরাজজী নিজেই বললেন যে তিনি সকলের সঙ্গে একসঙ্গে ভোজন করবেন। পরবর্তীকালে তিনি যেমন যেমন সঙ্ঘকার্যে যুক্ত হয়েছেন তেমনই তাঁর ব্যবহারে কেমন পরিবর্তন এসেছে তা সর্বজনবিদিত (ধার্মিক স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও)।

অনেক বার হিন্দু সমাজে অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ ও ঝগড়া হতে দেখা যায়, তার মূল কারণ রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত বিবাদ। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক লোকেরা বা সম্পর্কিত ব্যক্তি ওই বিবাদকে দুই জাতির সংঘর্ষের রূপ দেয়। যাতে নিজেদের গায়ের চামড়া বাঁচিয়ে রাজনৈতিক লাভ তোলা যায়। এই সময় অনেক সৎবুদ্ধিজীবী বা সাংবাদিক বন্ধুও অজ্ঞানতাবশত তাদের মদত দেয়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঝগড়াকে সম্প্রদায়গত সঙ্ঘর্ষের রূপ দেওয়া হয়, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত ঝগড়াকে বা অত্যাচারকে জাতিগত আখ্যা দেওয়া হয়। এটা কখনই উচিত নয়।

তথাকথিত অবহেলিত বা অস্পৃশ্য বন্ধুরা অনেক অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করেছে। ওদের এটাও মনে রাখতে হবে যে সমাজের সব স্তরের মানুষ অনুভব করে যে এটা ভুল এবং তা বন্ধ হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে সবাই যত্নশীলও বটে। তাঁদেরও আশা (অস্পৃশ্য) যে, অন্যায় সমাপ্ত হয়ে সকলের সঙ্গে সমানতা প্রাপ্ত হোক। সুতরাং সবলোকের এই বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। এই প্রচেষ্টার জন্য পরিপূরক ভাষা ব্যবহার এবং উপযুক্ত আচরণ করা আবশ্যক। সমাজের অন্যায় বিষয়েরও খারাপ নিন্দা অথবা সমালোচনা অবশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের সমাজের দোষগুলির প্রতি ব্যথার অনুভব প্রকাশ পাওয়া চাই। বিদেশি লোকেরা যেমন আমাদের পর ভেবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, সেরকম ভাব আমাদের থাকা উচিত নয়। সকলকেই এ বিষয়ে সাবধানতা রাখতে হবে। অতীতের ঝগড়াকে বর্তমানে টেনে এনে ভবিষ্যৎকে বিপদে যেন না ফেলা হয়। আমরা সকলে এই সমাজের অঙ্গ। সুতরাং আমরা অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকব— এইরকম বাস্তবিক আগ্রহ রাখা উচিত। এরকম করলে অবহেলিতদের বিশাল সমাজ ও শক্তি একজোট হয়ে সেই শক্তির ভিত্তিতে আশানুরূপ সমতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হবে।

মহাত্মা ফুলে, গোপালরাও আগরকর, ড. আম্বেদকর প্রমুখ মহাপুরুষ সমাজের কুরীতিতে বড় আঘাত হেনেছেন। কিছু জাতি বা গ্রন্থের প্রতি কড়া সমালোচনাও করেছেন। তার কী প্রয়োজন ছিল বা ওই সময়ের পরিস্থিতি কী ছিল, তা বুঝতে হবে। মানুষ শুরুতে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত করার জন্য বা জনমত জাগরণের জন্য কড়া ভাষা প্রয়োগ করে, কিন্তু সবসময়ের জন্য এরকম করতে থাকা ঠিক নয়। আমার ধারণা, তথাকথিত অবহেলিত বন্ধুরা কারও করুণা চায় না, সবার সঙ্গে সমানতা চায়, তাও নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারাই।

এখনও পর্যন্ত অবহেলিত ভাইয়েরা পিছিয়ে থাকার কারণে সবপ্রকার সুযোগ সুবিধা পেতে চায়। এই দাবি ও আশা তাদের ন্যায্য। কিন্তু একদিন না একদিন তাদের সমাজের সমস্ত শ্রেণীর সঙ্গে যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমানতা প্রাপ্ত করতে হবে— এটাও তাদের মানতে হবে। অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও হিন্দুদের নিজেদের কিছু বিশেষত্ব আছে। জীবন সম্বন্ধে তাদের কিছু কল্পনা, বিশ্বাস আছে। বিশ্বের চিন্তাশীল লোকেরাও স্বীকার করে যে সমাজে কিছু শাশ্বত মূল্যবোধ স্থাপিত রয়েছে। সুতরাং এই জীবন মূল্যগুলিকে যারা মানেন, আচরণ করেন— তাঁদের দ্বারা নির্মিত একরস, সমতাযুক্ত, সংগঠিত হিন্দুসমাজ খাড়া হলে এই বিশেষত্বগুলি টিকে থাকবে এবং বিশ্বের জন্য উপযোগী হবে। সবাই ঈশ্বরপুত্র, আরও অধিক বললে সবাই ঈশ্বরের অংশ, এই মত পোষণকারী হিন্দুধর্মে উঁচু নীচু ভাবনা নিয়ে ড. আম্বেদকর গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বাস্তবে সমানতা স্থাপিত করার জন্য এর চেয়ে বড় ভিত্তি আর কী হতে পারে? সুতরাং হিন্দুদের একতা আবশ্যক এবং তার ভিত্তি সামাজিক সমতা— এই ভাবনা সব বন্ধুদের করতে হবে এবং রাষ্ট্রকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের সমাজের ইতিহাস খুবই দীর্ঘ এবং ভাবনা ও আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকার জন্য পুরনো গ্রন্থে এমন কিছু বাক্য উল্লেখ আছে যার বিপরীত অর্থ করে বিষয়ের বিপর্যয় করা যেতে পারে। এই সংস্কৃতিতে স্ত্রী জাতিকে তুচ্ছ মানা হয় তার জন্য 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' উল্লেখ করা হয়, আবার অন্যপক্ষে স্ত্রীকে সমাজে কত উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে বলার জন্য 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যতে রমন্তে তত্র দেবতা' এরকম কথাও বলা হয়েছে। যাঁরা সমাজের একতা চান তাঁদের যা যা বলা আবশ্যক তা সবার সামনে কীভাবে রাখা হবে, বিপরীত ধারণা কীভাবে দূর হবে, কীভাবে সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি হবে— সেই লক্ষ্যে সবাইকে প্রয়াস করতে হবে।

(১৯৭৪ সালে পুণাতে 'বসন্ত ব্যাখ্যানমালায়' প্রদত্ত ভাষণ)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

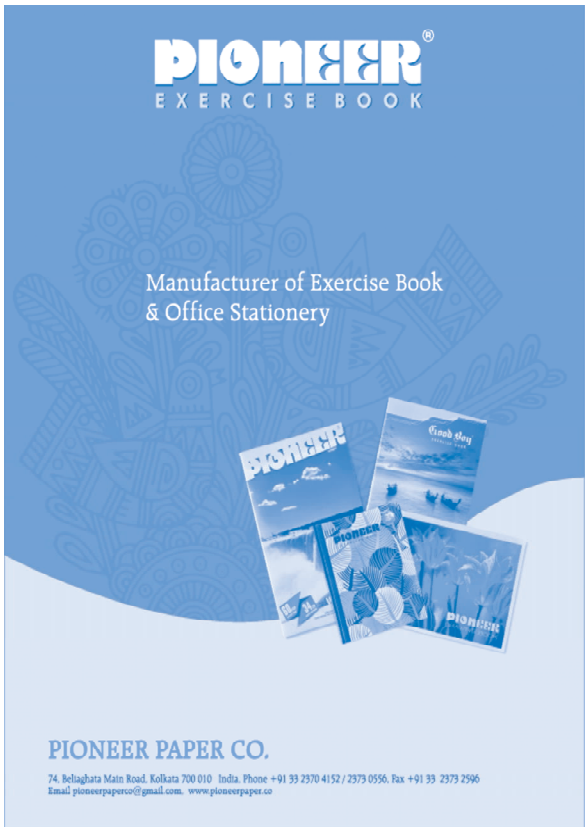

‘ জাতির এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় চাহিদা হল শিক্ষার। বিদ্যা আমাদের অবশ্য প্রয়োজন আর তা অর্জন করতে আমরা বদ্ধপরিকর।
একটি জাতির পক্ষে বুদ্ধিকে কেবলমাত্র রুটি রোজগারের উপায় রূপে নিযুক্ত করার চেয়ে অবমাননাকর আর কিছুই হতে পারে না।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

রসুনের উপকারিতা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

রান্নাকে সুগন্ধি ও সুস্বাদু করার জন্যে এবং ওষুধ হিসেবে রসুনের ব্যবহার মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রায় ৭ হাজার বছরের পুরনো। ইদানীং গবেষণায় জানা গেছে যে allicin ও diallyl sulphide-এর উপস্থিতিই রসুনকে এমন শক্তিশালী রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলেছে। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে মাত্র একক মিগ্রা allicin প্রায় পনেরো ইউনিট পেনিসিলিয়ামের সঙ্গে সমতুল্য। রসুনের রোগ নিরাময় ক্ষমতা এতটাই শক্তিশালী যে যে কোনো সময়ে কিছু কিছু বাজার চলতি ওষুধকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে।

রসুনের পুষ্টিগুণ : শক্তিমাত্রা-১৪৯ কিলোক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট-৩৩.০৬ গ্রাম, চিনি-১ গ্রাম, ফাইবার-২.১ গ্রাম, ফ্যাট-০.৫ গ্রাম, প্রোটিন-৬.৩৯ গ্রাম, বিটা ক্যারোটিন-৫ মাইক্রোগ্রাম, ক্যালশিয়াম-১৮১ মিগ্রা, আয়রন-১.৭ মিগ্রা, ম্যাগনেসিয়া-২৫ মিগ্রা, ফসফরাস-১৫৩ মিগ্রা, পটাশিয়াম-৪০১ মিগ্রা, সোডিয়াম-১৭ মিগ্রা, জিঙ্ক-১.১৬ মিগ্রা, ম্যাঙ্গানিজ-১.৬৭ মিগ্রা, সেলেনিয়াম-১৪.২ মাইক্রোগ্রাম।

রসুনের গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ রসুনে উপস্থিত অ্যালিসিন জাতীয় সালফার যৌগ।

রোগ প্রতিরোধে রসুন : শ্বাসনালির সংক্রমণ : সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি বিভিন্ন শ্বাসনালির সংক্রমণ জনিত অসুখে রসুনের ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এক্ষেত্রে তাজা রসুনের কোয়া রান্নায় বা কাঁচা অবস্থায় একটি করে দিনে তিনবার খেতে হবে। পরিবর্তে গার্লিক ক্যাপসুলও খাওয়া যেতে পরে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে। ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, সেলেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানে ভরপুর হওয়ায় রসুন প্রদাহজনিত সংক্রমণ কমায়। অ্যাজমাতে ১০ ফোঁটা রসুনের রস ২ চা-চামচ মধু সহ নিয়মিত খেতে হবে।

কার্ডিও-ভাস্কুলার ডিজিজ : রসুনের সালফার যৌগ ও অ্যালিসিন রক্তে কোলেস্টোরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা স্বাভাবিক রাখে, এল.ডি.এল.-এর মতো খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং এইচ.ডি.এল.-এর মতো ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়, ফাইব্রনোলাইসিস ত্বরান্বিত করে অর্থাৎ রক্তনালিতে রক্তের জমাট বাঁধা প্রতিহত হয়, রক্তনালীর গাত্রে নাইট্রিক অক্সাইডের উৎপাদনের হার বাড়িয়ে রক্তনালীর স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে, রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে এবং ফলস্বরূপ আর্টারিও স্ক্লেরেসিস এবং হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। উপকার পেতে হলে দিনে ২/৩ কোয়া রসুন খেতে হবে।

ক্যানসার : যারা নিয়মিত কাঁচা বা রান্নায় রসুন খান তাঁদের স্টমাক ও কোলোরেকটাল ক্যানসারের সম্ভাবনা অন্যান্যদের তুলনায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ কম। রসুনের কোয়েরসেটিন, ডাই অ্যালাইল সালফাইড, অ্যালিন, আজোইন ইত্যাদি কার্সিনোজেনিক এজেন্টকে ব্লক করে দেয়, ফলে নাইট্রোসোমাইন, অ্যাফ্লাটক্সিন ইত্যাদি কার্সিনোজেনিক এজেন্টের প্রভাবে স্টমাক ও লিভার ক্যানসারের আশঙ্কা খানিকটা কমানো যায়। তন্দুরি বা গ্রিলড মাছ বা মাংসে রসুন থাকলে এর কার্সিনোজেনিক প্রভাব কমে।

ত্বকের সংক্রমণ : ফোড়া, ফুসকুড়ি, পোড়া ও ত্বকের নানা ফাংগাল ও ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানে রসুনের রস দিয়ে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

সাইনাস : সাইনুসাইটিসের সমস্যা থাকলে মাখনে রসুন ভেজে পাউরুটিতে মাখিয়ে খেয়ে দেখতে পারেন।

অস্টিও আর্থ্রাইটিস : যারা অস্টিও আর্থ্রাইটিস, গাউট ও রিউম্যাটিজমের মতো সন্ধির প্রদাহজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন নিয়মিত কাঁচা অথবা রান্নায় অন্তত ২-৪ কোয়া রসুন খান।

স্টমাক আপসেট : পেটে গ্যাস, পেটফাঁপা, ডায়েরিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রেও রসুন উপকারী।

অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল : তাজা রসুন কাঁচা বা রান্না অবস্থায় খেলে ই কোলাই, স্ট্যাফাইকোকক্কাস অরিয়াস, সালমোনেলা, সিডডোমোনাস ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষতিকর রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

রসুনের অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যানালজেসিক ও পেইন রিলিফ প্রপার্টি থাকায় দাঁতের ব্যথা কমাতে দিনে দু-তিনবার কাঁচা রসুনের রস লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

দিনে কতটা রসুন খাবেন : বড়দের ক্ষেত্রে দিনে ২-৪ গ্রাম বা ২-৪টি রসুনের কোয়াই যথেষ্ট, তা কাঁচা বা রান্না যেভাবেই খান না কেন, অসুখ-বিসুখ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য গার্লিক ক্যাপসুল খেলে দিনে ৬০০-৯০০ মিগ্রার বেশি নয়।

সাবধানতা : কাঁচা রসুন বেশি পরিমাণে খেলে গায়ে ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, হজমের সমস্যা, ক্লান্তি, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাসলপেইন, চোঁয়া ঢেকুরের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। রসুনে যাঁদের অ্যালার্জি আছে তাঁদের স্কিন র‍্যাশ, জ্বর, মাথাব্যথা হতে পারে।

সার্জারি বা ডেলিভারির আগে বা পরে এবং যারা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট বা এইচ.আই.ভি./এইডস-এর ওষুধ খাচ্ছেন, তাদের জন্যে রসুন মোটেই উপকারী নয়।

দু' বছরের নিচের বাচ্চাদের রসুন খাওয়াবেন না। ▮

একদা গঙ্গাসাগর মেলায়

শেখর সেনগুপ্ত

সময় এক বিষম বস্তু। হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। যাবার আগে কিছু ঘটনা, কিছু মুহূর্ত অন্দরমহলে এমন আঁচড় কেটে যায় যে দু' যুগ তিন যুগ কেটে যাবার পরও লিখতে গেলে কোনো কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না। কলমের অভিমুখ অনাড়ষ্ট থাকে। আজ যখন আর একটা গঙ্গাসাগর মেলা নিকটবর্তী, আমি, শুদ্ধ হিন্দুবংশোদ্ভূত, চকিতে ফিরে যাচ্ছি পঁচিশ বছর পিছনে। নিয়োগকর্তা ব্যাঙ্ক আমাকে তখন রেখেছিল ব্যাঙ্কের হায়দরাবাদ স্টাফ কলেজে। হিন্দিতে অধিকার আমার কথঞ্চিৎ। তাই ইংরেজিকে ভরসা করেছি অর্থনীতি এবং ব্যবহার-বিজ্ঞান পড়াতে। ব্যাঙ্কের অফিসার তৈরি করবার কারিগর আমি। তবে বেতাল বিবাগির

মতন তাকিয়ে আছি কলকাতার দিকে— ম্যানেজমেন্ট আবার করে ফেরত পাঠাবে বাংলায়।

কলকাতার বাইরে থাকায় লেখালেখির খুব ক্ষতি হচ্ছে। সম্পাদকরা সচরাচর লেখা চান না। প্রকাশকরাও অধমকে প্রায় ভুলেই গিয়েছেন। মনোবেদনা চুঁইয়ে নামে। শেষমেশ ম্যানেজমেন্টের কাছে কাতর আবেদন জানাই। এই আধিকারিককে আর দুরমুশ করবেন না।

সুবিচার ও সদ্ব্যবহার কিন্তু মিলল। ক্ষমতাবানের অমৃত অঙ্গুলিহেলনে ফিরে এলাম কলকাতায়। তখন ফুরসত পেলেই ধূলিপদে কলেজপাড়ায় ঘুরঘুর। এখানে ওখানে লেখা ছাপা হচ্ছে। খান কয়েক বইও বেরিয়ে গেল। ধূসর সময় সবুজ হল এবং তখন পৌষসংক্রান্তির মোক্ষম ডঙ্কাও বেজে ওঠে। সারা ভারতের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের তখন অভিমুখ সাগরদ্বীপে কপিলমুনির আশ্রমের দিকে। পবিত্র গঙ্গার টানে যেন হাঁটু মুড়েছে দিগন্ত।

ওই সমস্ত কাতারে কাতারে আগত তীর্থযাত্রীর দেখভালের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনাকে একেবারে নক্কারজনক না বলা গেলেও তা অবশ্যই অপর্যাপ্ত। আমাদের ব্যাঙ্ক তখন মুচলেকা দিয়ে বসে আছে, মেলার ক'দিন গঙ্গাসাগরে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা যতটুকু দেবার, তারাই দেবে। এই নিয়ে জোনাল অফিসে শোরগোল। সকল অফিসারই হরেক অছিলায় সেই ঝক্কি-ঝামেলা এড়াতে চাইছেন। যাঁরা যুগপৎ ইউনিয়ন ও বড় আমলাদের গুড হিউমারে রাখতে পেরেছেন, তাঁদের তো নো তোয়াক্কা। পরিস্থিতি যখন এরকম, লোকাল ম্যানেজমেন্ট তখন হাতের কাছে পেয়ে গেল এই অধমকে। এ লোকটা আজ অবধি কোনো দায়বহনে নেতিবাচক সাড়া দেয়নি। মেজাজ করছে। বেশিরভাগ সময় ঘাড় কাৎ করে অথবা মৌন থাকে অথবা কথা বললেও তা যেন প্রায় গুঞ্জন।

মোদ্দা কথা, আজ্ঞা পাওয়ামাত্র সেই আমিই চললাম দুই অধস্তন কর্মীকে নিয়ে সাগরদ্বীপের উদ্দেশ্যে। আমার কিন্তু ভেতরে ভেতরে রীতিমতন আনন্দ ও উত্তেজনা। ভুলভ্রান্তি, মাশুল গোনা ইত্যাকার সম্ভাবনা বিলকুল লুপ্ত। ঈশ্বরে আস্থা ও প্রসন্নচিত্ত যদি মিলেমিশে থাকে, ফাঁকা প্রান্তরেও শঙ্খধ্বনি ওঠে, পূর্ণতায় সব কিছুই হয়ে উঠে পূর্ণ। এর প্রামাণিকতা আমার কাছে প্রশ্নাতীত।

ব্যাঙ্কের চারচাকা আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেল আট নম্বর লটে। অদূরে টিকিটঘর ও লঞ্চে ওঠার জেটি। মা গঙ্গা এখানে তাঁর বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে উচ্ছল। আমাদের পূর্বপুরুষ ভগীরথ মাকে নিয়ে এসেছিলেন মর্ত্যে এবং সেই জননীর দাক্ষিণ্য আজও অমৃতসমান।

লঞ্চঘাটে সে যে কী ভিড়, দু-চার কথায় বর্ণনা করা মুশকিল। চারিদিকে আবার কুয়াশা। মাথার ওপর গর্ভবতী মেঘ। কিন্তু প্রত্যেকের উৎসাহ অত্যুচ্চ। কাউকে পরিশ্রান্ত মনে হয় না। একজনও নিজের দেহভার নামিয়ে রাখার কথা ভাবে না। প্রচুর সাধু-সন্ন্যাসী। জটাজুটধারী। কিন্তু একজনকেও যেন ঠিকানাহীন বলা যাবে না। ঠিকানা সেই একটাই—কপিলমুনির মন্দির। স্মৃতিভারে অন্যমনস্ক নয়। দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং তা সামনের দিকে। আমার সঙ্গে যে দু'জন স্টাফকে দেওয়া হয়েছে, তাদের একজন বয়সে তরুণ, তেজি, কিন্তু এই কাজে সামিল হতে চায়নি। অফিস অর্ডারের কারণে আসতে হলো। দ্বিতীয়জন কিন্তু যথেষ্ট বয়স্ক ও অভিজ্ঞ। চাকরির মেয়াদ শেষ হতে আর এক বছরও বাকি নেই। গত মাসে তাঁর হার্টের তিন রকম পরীক্ষা করানো হয়েছে— কার্ডিয়াক এম আর আই, ইকো কার্ডিওগ্রাম এবং কার্ডিয়াক ক্যাথিটারাইজেশন। তিনটি রিপোর্টের চর্চায় বেরিয়ে এসেছে ক্রিটিক্যাল তথ্য। তাঁর হার্টের একটা ভালভ্ প্রায় ব্লক। অথচ তিনিই একরকম জোর করে ছিনিয়ে নিলেন এই অ্যাসাইনমেন্টটা। স্যার, পুণ্য

অর্জনের এরকম সুযোগ আমার জীবনে আর আসবে না, আমি জানি। মুখে তাঁর চওড়া হাসি। চলিষ্ণু লঞ্চের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জলযাত্রা। চারিদিকে থিক থিক করছে নর-নারী। দুই পাড়ে টুকরো টুকরো ছবি। অত চাপের মধ্যেও একজন পুণ্যার্থীও অসহিষ্ণু নন। কয়েকজন চুটিয়ে গল্প করছেন। অপরিচিতরা পরিচিত হচ্ছেন। সকলের প্রীতিপূর্ণ সঙ্কল্প, সাহস এবং আত্মবিশ্বাস। এটাই আমাদের ধর্ম। যারা এর তাৎপর্য বোঝে না অথবা বুঝেও ক্ষমতালাভের আশায় নানারকম ভনিতা করে, তাদের শত ধিক্। আমার সেই দুর্বল হৃদপিণ্ডবাহী বয়স্ক সহকর্মী অনাবিল আবেগ নিয়ে আমাকে শোনালেন, 'স্যার, আমি আজকাল অনেকরাত পর্যন্ত স্বামীজীর লেখা পাঠ করি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে স্বামীজীর সেই উপলব্ধিকে— যা আমার একেবারে মুখস্ত। আমাদের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার রাজনীতি, ওই বাগাড়ম্বরপূর্ণ সমাজনীতি— হে ভণ্ড, এবার স্তব্ধ হও।... দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এ দেশে যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ কাজ যা হবার ধর্মের মধ্য দিয়েই হবে; নইলে সব ঘোড়ার ডিম, তোমাদের ওই চেঁচামেচিই সার।'

আমি নিজে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রিত। স্বামী অপূর্বানন্দজী আমাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। গঙ্গাসাগর মেলায় দায়িত্ব পালন করতে গেলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘই আমাকে ও আমার দুই সহকারীকে ঠাঁই দিল। সারাদিন হাসিমুখে কাজ করেছি। পরদিন মহাস্নান। সন্ধ্যায় দেখা গেল বিশাল বেলাভূমি জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট আলো। সাগরে ঝাঁপ দেবার আশায়। আমি তখন গুটি গুটি কপিলমুনির মন্দিরে ঢুকে পড়েছি। এখানে কর্মরত অনেকেই আমাকে চিনে ফেলেছেন। আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ঋষি কর্দম ও দেবস্তুতির সিদ্ধপুত্র কপিলের দিকে। ইনিই কিন্তু ভগবান শ্রীহরি। 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'। সাংখ্য দর্শনের প্রণেতার চরণে নিজেকে নিবেদিত করি।

তখনই পিঠের ওপর কার যেন হাত। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, তিনি মন্দিরের প্রবীণতম পুরোহিত। উত্তরপ্রদেশের লোক। ভাঙা ভাঙা বাংলা ও হিন্দির মিশেলে চলল আমাদের আলাপচারিতা।

'সাহেব, কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে সাগরে ডুব দিচ্ছেন তো?'

'ইচ্ছে তো আছে।'

'এই মহাস্নানের অর্থ কী জানেন? এর অর্থ হলো, নিজেকে আরও শুদ্ধ ও পরিবর্তিত করে তোলা। পরিবর্তন খুব দরকার। পরিবর্তনই ধর্মের শর্ত। অন্যথায় মনুষ্যত্বেরও অপমান।'

কী অমোঘ নিদান!

আড়াই দশক আগে শুনেছি। আজও কানে বাজে। প্রতিটি উচ্চারণ ব্যঞ্জনাময়।

সেই পঁচিশ বছর আগেও আমি পরিবর্তন চেয়েছিলাম। সাড়ে চার বছর আগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। মনে হলো, এতদিনে পরিবর্তন এসেছে। ক্রমে হতাশা বাড়ে, ক্ষোভ বাড়ে, লজ্জা বাড়ে।

পরিবর্তন আজও আসেনি।

এবার কী আসবে? ▮

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

SURYA
Energising Lifestyles
WHY SURYA LED?
The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of
Eco Friendly
Instant Lighting
Low Maintenance
High Energy Efficiency
High Power Factor
Lasts upto 25000 hrs
Wide Operating Voltage Range*
WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS
Wide beam angle for better light spread
SURYA LED
5W MRP ₹350/-
www.surya.co.in
lighting
fans
appliances
pipes
*voltage range 100V - 300V
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

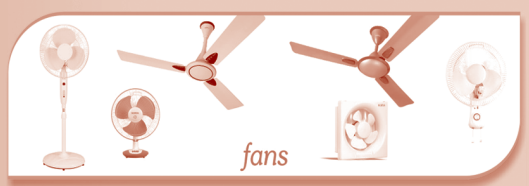

কলকাতায় কুমারসভার উদ্যোগে ডাঃ হেডগেওয়ার ব্যাখ্যানমালা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ারের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় গত ২৭ ডিসেম্বর পঞ্চম ব্যাখ্যানমালার আয়োজন করে। ব্যাখ্যানমালায় প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহসেবা প্রমুখ গুণবন্ত সিংহ কোঠারী। তিনি বলেন, ডাঃ হেডগেওয়ার সঙ্ঘ শাখার অভিনব পদ্ধতির মাধ্যমে এক এক ব্যক্তির মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত করার অপূর্ব কাজ করেছেন। তার ফলে হাজার হাজার কার্যকর্তার মধ্যে হিন্দু স্বাভিমান জাগছে যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংগঠন দাঁড় করিয়ে সমাজে সেবাকাজের এক সুন্দর পরিবেশ নির্মাণ করেছেন।

কেশজীকে (দীক্ষিত) মাল্যার্পণে ভূষিত করছেন অরুণ মল্লাবত। পাশে লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা।

কার্যক্রমে সভাপতিত্ব করেন সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক ও পুস্তকালয়ের সাহিত্য ও লেখন সমিতির সংযোজক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিতকে সংবর্ধনা জানানো হয়। শ্রী দীক্ষিতকে তিলক ও মাল্যার্পণে ভূষিত করেন পুস্তকালয়ের কোষাধ্যক্ষ অরুণ প্রকাশ মল্লাবত এবং শাল পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান গুণবন্ত সিংহ কোঠারী। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে কেশবজী ডাঃ হেডগেওয়ারের সান্নিধ্যের বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেশবজী স্বয়ংসেবকদের কাছে, বিশেষত বাংলার স্বয়ংসেবকদের কাছে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৫০-এর জুনে মহারাষ্ট্র থেকে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে বাংলায় এসেছেন এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাতেই সঙ্ঘের কাজ করে চলেছেন। সঙ্ঘের ছয়জন সরসঙ্ঘচালকেরই সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছেন। বাংলায় সঙ্ঘের বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অন্যতম।

মহারাষ্ট্রের পুলগাঁও-য়ে তাঁর জন্ম। মা শ্রীমতী সগুনা বাঈ ও বাবা দত্তাত্রেয় দীক্ষিত। বাবা বস্ত্র নির্মাণ কারখানার ম্যানেজার ছিলেন। চাকরির সূত্রে বিভিন্ন স্থানে বদলি হওয়ার কারণে তাঁকে গোয়ালিয়র, নাসিক প্রভৃতি স্থানে যেতে হয়েছিল। প্রথম জীবনে কংগ্রেসের ভাবধারায় বিশ্বাসী হলেও সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি সঙ্ঘের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯৩০ সালে জঙ্গল সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের জন্য ডাঃ হেডগেওয়ার পুলগাঁও-য়ে আসেন। স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠানে ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে শ্রী দত্তাত্রেয়জীর পরিচয় হয়। কালক্রমে এই পরিচয় এতটাই ঘনিষ্ঠ হয় যে ডাক্তারজী তাঁকে পুলগাঁও-য়ের সঙ্ঘচালক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

সমাবেশ সমাচার

১৯৩৮ সালের ঘটনা। ডাক্তারজী পুলগাঁও শাখাতে এসেছেন। বালক কেশব ও তাঁর দাদাও শাখায় গেছেন। কথাপ্রসঙ্গে বালক কেশবকে দেখিয়ে ডাক্তারজী তাঁর পিতা দত্তাত্রেয়জীকে বললেন, এই বাচ্চাটিকে আমাকে দিয়ে দিন। তাঁর বাবাও ডাক্তারজীর কথায় সায় দিয়ে বলেন, নিয়ে যান। সেই সময় কেশবজীর বয়স ছিল মাত্র সাড়ে তেরো বছর। সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে তখন থেকে তিনি সক্রিয়। ১৯৪১ সালে তিনি সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সাল থেকে তিনি সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের শিক্ষক। ১৯৪৭ সালে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে স্বদেশ ও হিন্দুসমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। সঙ্ঘের কাজের জন্য তাঁকে প্রথমে জলগাঁও-য়ে পাঠানো হয়। ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর কথামতো তিনি বাংলায় আসেন। সেই সময় সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের প্রচারক ছিলেন একনাথ রানাডে। কেশবজীকে কলকাতায় বড়বাজার এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার সময় তিনি পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কাজ দেখাশোনা করতেন। ১৯৭৭ সালে সঙ্ঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর প্রথমে সহপ্রান্ত প্রচারক ও পরে প্রান্ত প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। কয়েকবছর পূর্বক্ষেত্রের সহক্ষেত্র প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। যখন তিনি বাংলায় এসেছিলেন তখন বাংলার সঙ্ঘশিক্ষা বর্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৮ জন। এখন সেই বাংলাতেই চারটি সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে কথা বললে কেউ বুঝতে পারবেন না যে তাঁর মাতৃভাষা মারাঠী। বস্তুত তিনি বাংলারই একজন স্বয়ংসেবক— আপনজন হয়ে গেছেন। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। ▮

শব্দরূপ-৭৭৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	১	২			৩		
৪			■	■		■	■
	■	■	৫	৬		৭	
৮	৯		■	৯	■	১০	■
■		■	১০	■	১১		১২
১৩		১৪			■	■	
■	■	১৬	■	■	১৫	১৬	
১৭							■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা, **৪.** কিরাতার্জুনীয় কাব্যরচয়িতা সংস্কৃত কবি, **৫.** যার শত্রু জন্মে নাই; প্রাচীন মগধের রাজাবিশেষ, **৮.** বাসস্থান, লোকালয়, **১১.** রামায়ণে বিভীষণপত্নী, **১৩.** অতিশয় বেদনা ('কাকস্য—') **১৫.** কশ্যপপত্নী দনুর গর্ভজাত; অসুর, **১৭.** যা ঘটা কঠিন।

উপর-নীচ : ১. শিব, **২.** সূর্য, **৩.** প্রিয়, বল্লভ, **৪.** শুক্রাচার্য; পরশুরাম, **৬.** ভেলকি, ইন্দ্রজাল, **৭.** ব্যাধ, **৯.** এক প্রকার কলা, **১০.** ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র, **১২.** কৃষ্ণ; বসন্তকাল; বৈশাখ, **১৪.** বিনা তারে যা সাধিত হয়, **১৫.** জ্বালা, যন্ত্রণা ('গান—'), **১৬.** 'আমার মাথা—করে দাও হে তোমার চরণধুলার পরে'।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৭১
সঠিক উত্তরদাতা

রাহুল সেন
পাকুড়, ঝাড়খণ্ড
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

ফে	লু	না	থ	■	ক	পি	শ
পা	■	দ	ম	ক	ল	■	কু
তু	লা	■	ক	ল	ম	■	ন
রা	স	ভ	■	স	দা	■	■
■	■	ব	উ	■	ন	কু	ল
ইঁ	■	তা	র	কা	■	শ	শ
দু	■	র	স	ক	লি	■	ক
র	ক্ষ	ণ	■	লি	পি	ক	র

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৭৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ১২

থাকে যদি
ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন

pure INDIAN SPICES

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.

207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007

email : dutaspice@gmail.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
11 January - 2016 - Rs. 10.00

Bharat Petroleum
energising lives

BPCL introduces

SmartLine

Toll-free 1800 22 4344

Ek Call...Sab Solve

Bharatgas COOK FOOD. SERVE LOVE.
MAK LUBRICANTS MAK makes it possible.
Speed High Performance Petrol

At Bharat Petroleum, customers and their convenience are the epicenter of all our business operations. That is why we always develop and deliver various products and services which make things simple for you.

With the same goal, we have now introduced SmartLine - a single window system to listen to all your queries, suggestions and feedback related to any of our offerings.

It will also function as a 24x7 Emergency Helpline to provide immediate assistance. This Toll-Free number is a direct connect between our customers and field teams. So connect with us anytime.

We are just a call away!

www.bharatpetroleum.in